

ডায়ালগ প্রতিবেদন

কৃষি ও জলবায়ু সংকট



রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)



ডায়ালগ প্রতিবেদন

কৃষি ও জলবায়ু সংকট

সম্পাদনা

মনিরুল ইসলাম খান
সুরাইয়া বেগম


ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG
SOUTH ASIA

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH 

কৃষি ও জলবায়ু সংকট Agriculture & Climate Crisis

সম্পাদনায় Edited By

মনিরুল ইসলাম খান, সুরাইয়া বেগম Monirul Islam Khan, Suraiya Begum

প্রকাশকাল Published in
ডিসেম্বর ২০১৯ December 2019

প্রকাশনায় Published By

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
বাড়ি ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি, বানানী House 07 (Kajoli), Road 17, Block C, Banani
ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ Dhaka-1213, Bangladesh
ফোন: (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২ Phone: (+880-2) 9820051-2
ইমেইল: rib@citech-bd.com Email: rib@citech-bd.com

সহায়তায় Supported By

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আর এল এস) Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)
ফ্রান্স-মেহরিং-প্লাটজ ১ Franz-Mehring-Platz 1
১০২৪৩ বার্লিন, জার্মানী 10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.de/en/ Website: www.rosalux.de/en/

মুদ্রণে Printed by

ইউনিট্রেড কর্পোরেশন Unitrade Corporation
৩২৫ আহমেদ নগর, মিরপুর-১, ঢাকা বাংলাদেশ 325 Ahmed Nagar, Mirpur-1, Dhaka-1216
মোবাইল: ০১৭১২৯৬২৬৯৯ Mob: 01712962699

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

মুখবন্ধ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)-এর সহায়তায় ২০১৭ সাল থেকে “প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ এবং গণগবেষণা” নামে একটি প্রকল্পে কাজ করছে। প্রকল্পটির বিষয়বস্তু কৃষি, কৃষি-প্রতিবেশ, কৃষক সমাজ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব, নিরাপদ খাদ্য প্রভৃতি। প্রকল্পটির কাজের উদ্দেশ্য উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্বেষণ ও কৃষক সমাজে এর চর্চা করা। রিইব মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একশন রিসার্চের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। সেই সাথে প্রকাশনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়াও রিইব-এর অন্যতম উদ্দেশ্য।



ড. শামসুল বারি

জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর মালিকানা একটি সামাজিক শক্তি। আজকে বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আমাদের কৃষক সমাজ শিক্ষা ও প্রযুক্তির যে স্তরে রয়েছে তাতে জ্ঞান-সম্পর্ক অনেক বেশি অসম হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে তার নানাবিধ অধিকার এবং দেশ ও বিশ্ব কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন করাই তার উন্নয়নে সহায়তা করার প্রথম পদক্ষেপ। রিইব জ্ঞানের এই অসমতা কমিয়ে আনা এবং কৃষকের মাঝে জ্ঞানকে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা-লেখি ও তথ্য বাংলায় প্রকাশ করছেন এবং সেসব প্রকাশনা গণগবেষণা দলে এবং স্থানীয় স্কুলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে, এই জ্ঞানকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে।

‘কৃষি প্রতিবেশ’ বিষয়টি যখন থেকে মানুষ ভূমি কর্ষণ করা শুরু করেছে তখন থেকেই শুরু। বৈশ্বিক পরিসরে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এর এক ধরনের ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তি যত বেশি প্রসারিত হয়েছে প্রতিবেশ তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যে ধরনের প্রতিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই ক্ষতিগুলো যে কৃষকদেরকে সরাসরি প্রভাবিত করছে তাকে তুলে ধরা এবং এই সংক্রান্ত জ্ঞান কৃষক ও অন্যদের সাথে বিনিময় করা এসব বই প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

রিইব আরও মনে করে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে বিভিন্ন সেক্টরে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাঁদের কাছেও আমাদের এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে যাতে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে পারে। রিইব তাই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী। এই সম্মিলিত প্রয়াস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করবে তেমনি জনগণের কাছে নিরাপদ খাদ্য পৌঁছে দেবার চেষ্টায় জ্ঞান উৎপাদন করবে।

এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে এই ধরিত্রীর প্রতিবেশ সুস্থ থাকে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে রিইব এর ক্ষুদ্র প্রয়াস এইসব প্রকাশনা।

শামসুল বারি

চেয়ারম্যান, রিইব।



ভূমিকা

জলবায়ু সংকটের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যেই নানারকম জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বিদ্যমান থাকলেও কার্যক্ষেত্রে এই সংকট নিরসন বা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরিমাণ খুবই নগণ্য। তারপরও এই সংকটের প্রতি সবাই যে উদাসীন তা বলা যাবে না। সম্প্রতি Greta Thunberg নামে সুইডেনের ছোট্ট একটি মেয়ে তার পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে এই মারাত্মক সংকট সম্পর্কে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য, যে সংকটের মাঝে অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়ার মত সব রকম সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে এই বিষয়ে সবাই অবগত যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসে উন্নীত হয়েছে এবং এটি পৃথিবীর জন্য ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসা শুরু করেছে। ঋতু আবর্তনের ক্ষেত্রে একটি বিশাল পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করছি যেখানে খরার সময়কাল বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃষ্টিপাতের সময়সূচীতে বিঘ্ন ঘটতে দেখা যাচ্ছে। লবনাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভাঙ্গন, দাবদাহ এবং আরও নানা সমস্যা বর্তমানে একটি “নতুন স্বাভাবিক অবস্থার” চিহ্ন হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এই ধরনের বিপর্যয়কারী পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেনের মত গ্রিন হাউজ গ্যাসগুলো তাপমাত্রাকে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুম-লে আটকে রাখে। এই গ্যাসগুলোর ঘনত্ব প্রাক-শিল্পায়িত পর্যায়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে জলবায়ুর উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছে। তবে এই বিষয়টি জানা ও এর উপর কাজ করা দুটি আলাদা বিষয়

কারণ শিল্পায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। শিল্পায়নের ঘটনাটি কয়েক শতাব্দী ধরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যেটি রাতারাতি পরিবর্তন করে ফেলা সম্ভব নয়।

শিল্প কারখানাগুলো বায়ুম-লে কার্বন নিঃসরণ করে যা অবশেষে গ্রিন হাউজ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। আর এই প্রক্রিয়াটি দ্রুত পরিবর্তন করা বা থামিয়ে দেয়া সহজ কাজ নয়। আমরা জানি যে জাতিসংঘ এই সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে এবং এই লক্ষ্যে তারা ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসিসি) ও ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) গঠন করেছে। এগুলো বিভিন্ন সম্মেলন ও চুক্তি যেমন কিয়টো প্রোটোকল অথবা প্যারিস চুক্তি ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে। এই চুক্তিগুলো ঐক্যমতে পৌছায় যেকোনো মূল্যে কার্বন নিঃসরণ দমন করতে হবে। তবে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এটি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে যা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমা শিল্পায়িত জাতিগুলো আশঙ্কাজনকভাবে এই সংকটের প্রতি ধীরগতিতে সাড়া দিচ্ছে এমনকি কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। ‘কার্বন ট্রেড’-এর নামে তারা উন্নয়নশীল বিশ্বের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সঙ্কুচিত করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও সমৃদ্ধশালী করার ব্যবস্থা করেছে। শুরুর দিকে প্রশমনের উপর গুরুত্ব দেয়া হলেও বর্তমানে স্থিতিস্থাপকতা ও অভিযোজনের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এই ধরনের বাঁক পরিবর্তন বা নিক্রিয়তার পেছনে কারণ কী? এখানে কর্পোরেট পুঁজির প্রতি কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, শিল্পায়ন ও মুনাফার মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। যার ফলে শিল্পায়নকে বন্ধ করা বা থামিয়ে দেয়া হলে তা কর্পোরেট পুঁজি প্রবাহকে হ্রাস করে দেবে। এটাই পশ্চিমা শিল্পায়িত জাতিগুলোর নিক্রিয়তার প্রধান কারণ।

বাংলাদেশের মানুষের তাহলে এখানে করণীয় কী? তারা শুধুমাত্র জলবায়ু সংকটের ভয়াবহ ঝুঁকিতেই অবস্থান করেছে না, পাশাপাশি সবুজ বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাবের ভেতর দিয়েও তাদেরকে যেতে হচ্ছে। যার ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক একটি হুমকির মুখে রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ইতোমধ্যেই জলবায়ু সংকটের নেতিবাচক প্রভাবগুলো আরম্ভ হয়ে গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উন্নয়নশীল দেশের কৃষিতে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি দেখা দিচ্ছে, কারণ এখানকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা আবহাওয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু সহিষ্ণু হতে কারোরই আপত্তি থাকার কথা না, তবে সেসব নীতি-কৌশলের স্বরূপ কী হবে, এর পেছনে কারা ভূমিকা নিচ্ছে, উন্নয়নশীল সমাজ সেটাকে কীভাবে নেবে, প্রভৃতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তাভাবনা, আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা হওয়া দরকার।

দেখা যাচ্ছে, কেবল জনসংখ্যার বৃদ্ধিই একমাত্র কারণ নয়, বরং উন্নত বিশ্বের ভোগবাদের চাপেও অল্প সময়ে ও ক্ষুদ্র পরিসরে অধিক ফসল উৎপাদন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর এই অধিক

উৎপাদনের দায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তথাকথিত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সমাজের কাঁধে চাপছে। এটি করতে গিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার হিসেব কষা হয়নি কিংবা ক্ষতির হিসেব কষলেও সেটা প্রকাশ করা হয়নি।

রিইব জলবায়ু সংকট ও সবুজ বিপ্লব সম্পর্কিত জ্ঞান প্রচার করার জন্য গত ৬-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে চার দিনব্যাপী জলবায়ু সংকট ও কৃষি নিয়ে আবাসিক স্কুলের আয়োজন করেছিল যেখানে বিভিন্ন একাডেমিয়া, এনজিও, পেশাদারি ব্যক্তি, সুশীল সমাজ ও অন্যান্যদের মাঝে জলবায়ু সংকট মোকাবেলার লক্ষ্য নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরির উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি ও বেসরকারি সংযোগকে সুসংহত করার মাধ্যমে উক্ত যোগসূত্রকে আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর ২০১৯ একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উঠে আসে যে, পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবস্থাকে উপযুক্ত ও শক্তিশালী রাখতে সরকার, গবেষক ও কৃষকদের সমন্বিতভাবে কাজ করা দরকার। যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ফসলী জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে অধিক ফসল উৎপাদন যুগের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু অধিক ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক না, যাতে প্রতিবেশ ব্যবস্থা তথা প্রকৃতির ভারসাম্য হুমকির মধ্যে পড়ে, এবং প্রকারান্তরে মানুষের জীবনধারণও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোজনের পক্ষে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছি সেগুলো টেকসই হতে হবে, যেখানে শস্য আবর্তন থাকবে, স্থানীয় ঐতিহ্যগত জাতের চাষ হবে, বীজের উপর কৃষকের অধিকার থাকবে ও প্রতিবেশ বাঁচবে, তথা স্থানীয় খাদ্য সার্বভৌমত্ব গড়ে উঠবে। কৃষি, পানি, বন ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনার সময় আমরা যেন আরো বেশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলতে পারি। উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনায় স্থানীয় প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় আনতে পারি, এবং আমাদের ক্ষতিসমূহ নিয়ে সমমনা সংগঠনগুলোর মধ্যে আলোচনা করতে পারি। এ ডায়ালগ থেকে উদ্ভূত তথ্য-উপাত্ত, ধারণা, আলোচনা সমালোচনা, প্রতিবেদন, পুস্তিকা ইত্যাদি কৃষি ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে বিদ্যমান চিন্তাচেতনা, শিক্ষা-গবেষণা, নীতি-কৌশলের পক্ষে ইনপুট হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়। “জলবায়ু সংকট ও কৃষি” বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকটিতে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)-এর চেয়ারপার্সন ড. শামসুল বারি সভাপতিত্ব করেন। রিইব-এর প্রকল্প পরিচালক সুরাইয়া বেগম এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে গোলটেবিল ডায়ালগ আরম্ভ করা হয়। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান। নির্ধারিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য উপস্থাপন ও সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সাথে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গোলটেবিল বৈঠকটি সম্পন্ন হয়।

সূচনা বক্তব্য : সুরাইয়া বেগম, প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব



সুরাইয়া বেগম

সারা পৃথিবীর মত বাংলাদেশেও আজ জলবায়ু সংকটের কারণে বিভিন্ন উদ্বেগজনক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে আমাদের দেশের বহু কৃষি জমির ফসল, মাছ বিনষ্ট হয়ে গেছে: ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ এর উপস্থিতিতে আমরা একটি আতঙ্ক ও সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলাম। বুলবুলের মতই সিডর, আইলা, ফণী ইত্যাদি দুর্যোগগুলো আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে হচ্ছে এবং এই বিষয়টা আমাদেরকে ভাবিত করে তুলছে। বিশেষ করে আমরা যখন কৃষি নিয়ে কাজ করছি, কারণ আমরা দেখেছি যে কৃষির সাথে জলবায়ুর একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ গবেষণায় সহায়ক একটি প্রতিষ্ঠান, কাজ করেছে ২০০২ সাল থেকে। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের জীবনের মানোন্নয়নে সহায়তা ও সমর্থন যোগানো। অর্থাৎ ব্যক্তির এক ধরনের আত্ম-উন্নয়ন, আমাদের সমাজ ও দেশের উন্নয়ন এবং এর সঙ্গে কীভাবে দারিদ্র বিমোচন করা যায় এবং আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা নিরসন করা যায় সেগুলো নিয়ে কাজ করা। আমরা যে প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি তা মূলত: কৃষি ও জীববৈচিত্র্য নির্ভর প্রকল্প, নাম হচ্ছে Agroecology from Below: Pedagogy & Participatory Action (2019)। এ প্রকল্পে প্রথম থেকেই সহায়তা করেছে জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আর এল এস)।

আমরা ২০১৩ সাল থেকেই জীববৈচিত্র্য ও কৃষি নিয়ে মূলত কাজ করছি, তবে আমরা দেখেছি যে কৃষির সঙ্গে জলবায়ুর খুবই নিবিড় একটা সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের জলবায়ু সংকটের মূল জায়গাটা হচ্ছে কার্বন নিঃসরণ এবং কার্বন নিঃসরণের ফলে যে তাপমাত্রা উৎপাদিত হচ্ছে তার দ্বারা পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে এবং সেই উত্তপ্ততার কারণে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। এর পাশাপাশি গবাদি পশু থেকে যে মিথেন গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে যেগুলো কিনা আমাদের জলবায়ু সংকটকে আরও দীর্ঘায়িত করছে, সমস্যা ভারাক্রান্ত করছে, এর সাথেও কৃষির একটি বড় ভূমিকা আছে। আমরা জেনেছি যে ৩৩% কার্বন নিঃসরণ ঘটে কৃষি থেকে যেটা সত্যিই বেশ বড় একটা পরিমাণ আমরা বলব। সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে আমরা যে কৃষিকাজ করছি সেটা আমাদের জলবায়ুকে সাপোর্ট দিচ্ছে নাকি খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষির সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্ক কী এবং জলবায়ু সংকট কৃষিতে কী ধরনের সমস্যা তৈরী করছে সেটাই হচ্ছে আজকের মূল বিষয়।

আমরা জানি যে সবুজ বিপ্লবের কারণে কৃষিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে যার ফলে কার্বন নির্গত হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যাচ্ছে। এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনমূলক কর্মকাণ্ডের কারণেও কার্বন তৈরী হচ্ছে। ফলে কার্বন নিঃসরণ কমাতে একজন ব্যক্তির বা একটি রাষ্ট্রের কি ভূমিকা থাকবে সেটাই হল দেখার বিষয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র কার্বন নিঃসরণে ভূমিকা রাখছে, যদিও সেটার পরিমাণ অনেক কম, তাই বলে কি আমরা এই বিষয় নিয়ে ভাববো না? আমরা যে দেশেরই হই না কেন, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিরও ভূমিকা আছে যে আমরা আমাদের পরিসরে যতটুকু সম্ভব কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারি। মূলত কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে মিটিগেশন, অ্যাডাপ্টেশন ও রিজিলিয়েন্স -এর কথা বলা হয়ে থাকে এবং এখন লস এন্ড ড্যামেজের কথাও বলা হচ্ছে। মিটিগেশন-এর সুযোগ কম তাই আমাদের এডাপ্টেশনের দিকে যেতে হবে। আর সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে আর সেই দায়িত্বগুলো নিয়ে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে; ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের কি করণীয় এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের যতটুকু সাধ্য আছে তার মধ্যেই আমরা এই পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে রেখে যেতে চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে।

**মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা : মনিরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

যদিও জলবায়ু সংকট নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা, আমি একটু ভিন্নভাবে আপনাদের দৃষ্টি অন্য দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কার্ল মার্ক্স মানবতাবাদী একজন দার্শনিক। তিনি বলেছিলেন, আমরা তো পৃথিবী সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি, এখন আমাদের দরকার পৃথিবীটাকে একটু বদলাবার। তার এই বিশেষ পর্যবেক্ষণটা আমি ব্যবহার করেছি আজকের আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে।



অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান

সাম্প্রতিক সময়ে Greta Thunberg নামে সুইডিশ একজন কিশোরী তার লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য নেমে পড়েছে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা সম্পর্কে আমরা সবাই ওয়াকিবহাল। কনফারেন্স অব পার্টিস যেটা কিনা ১৯৮৮ এর পর থেকে শুরু হয়েছিলো ইউনাইটেড নেশন্সের সহযোগিতায়, তারা প্রচুর কনফারেন্স করে যাচ্ছে, সায়েন্টিফিক মিটিং করে যাচ্ছে, তারা পরিমাপ করেছে যে আমরা জলবায়ু সংকটের কোন পর্যায়ে আছি কিন্তু তা

প্রতিকারের ক্ষেত্রে তাদের করণীয় পদক্ষেপের একটি বড় ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করছি। সুতরাং সেটাকে ফোকাস করেই আমি আমার আলোচনাটা এভাবে রাখছি যে একটি ছোট মেয়ে যদি এই স্বপ্ন দেখতে পারে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য, কেন আমরা তা পারব না এই ধরনের একটি প্রশ্ন আমি উত্থাপন করতে চাচ্ছি। আমরা যদি এক সেকেন্ডও নষ্ট করি এক্ষেত্রে, তাহলে আমরা আরও দশ সেকেন্ড এগিয়ে যাচ্ছি ধ্বংসের দিকে। সুতরাং তাত্ত্বিক আলোচনার সাথে সাথে যথাযথ সক্রিয় হওয়া দরকার সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য। আমি যে প্রেজেন্টেশনটা করছি, ক্লাইমেট ক্রাইসিস সম্পর্কে তার সাইন্সটা আমরা জেনেছি, এর কারণগুলোকে আমরা চিহ্নিত করেছি। কিন্তু এটার রেসপন্সটা খুব সামান্য, যেটাকে বলা হচ্ছে লুকওয়ার্ম রেসপন্স। আরও একটি ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে, আমরা প্রথমে এটাকে যেভাবে মোকাবেলা করছিলাম তার চেয়ে এখন আমরা ক্রমাগতভাবে আত্মসমর্পণের দিকে যাচ্ছি। আত্মসমর্পণকে মেনে নিয়ে আমরা এই সংকটের তীব্রতা থেকে বের হতে পারব না, বরং আমরা চেষ্টা করি কীভাবে আমরা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারব। প্যারিস এগ্রিমেন্ট থেকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা ২৪% কার্বন নিঃসরণ করে সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরে আসলে তাহলে এই একটি মাত্র রাষ্ট্রকে আপনি কিভাবে পর্যালোচনা করবেন? অর্থাৎ তাদের শিল্পায়ন, কার্বন নিঃসরণ যেভাবে চলছিল সেভাবে চলতে থাকবে, পৃথিবীর তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে সেভাবেই বাড়তেই থাকবে এবং আমরা সাইলেন্টলি সেটা অবজার্ব করতে থাকব এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হচ্ছে ১৫০ সেলসিয়াস আর ক্লাইমেট সাইন্টিস্টরা বলছেন সেটা হচ্ছে সহনীয় এবং তাতে কোনও সমস্যা ছিল না, জলবায়ু সংকট ছিল না, কৃষি স্বাভাবিক ছিল, ঋতুর আবর্তন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক বিজ্ঞানীরা বলছেন এটা ইতোমধ্যে ১.৫ ডিগ্রী বেড়ে গিয়েছে। এখানে শিল্পবিপ্লবের পর হু হু করে এই কার্বন নিঃসরণ বেড়ে যাচ্ছে। আর আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি সেটা ২ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভেতরে ভেতরে জানে যে এটা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠবে এবং সেটাকে ঠেকানোর কোনও উপায় নেই। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে কি পরিমাণ ভয়াবহ একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আমরা এখন নিত্য নৈমিত্তিকভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছি যা একটি ‘নিউ নরমাল’ বা “নতুন স্বাভাবিক অবস্থা” হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। সংকট হচ্ছে আমাদের নতুন স্বাভাবিক অবস্থা যার মধ্যে আমরা ঢুকে গিয়েছি। এই সংকটটা তৈরি করেছে বিজ্ঞান এবং এটা থেকে উত্তরণও ঘটাতে হবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। আর এটা একটা চ্যালেঞ্জ কারণ সবাই বিজ্ঞান জানে না। তাহলে আমাদের খুঁজতে হবে আমরা কতটা সাধারণের মধ্যে আমাদের উত্তরণের পথটা খুঁজতে পারি। আমরা কি বিজ্ঞানীদের উপরেই সবকিছু ছেড়ে দেব নাকি আমরা চেষ্টা করব স্পেস বের করতে যার মধ্যে সাধারণ মানুষ, রাজনীতিবিদ তাদেরও কিছু করণীয় আছে। আর এখানে আমরা দেখব বিজ্ঞানের উপর সমাজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

সাইসকে নিয়ে নিচ্ছে একটা বিশেষ গোষ্ঠী এবং তারা তাদের মত সেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে আর সেই বিজ্ঞানের ব্যবহার বা অপব্যবহার থেকে এই সমস্যাটি তৈরি হচ্ছে। ১৭৫০ সাল কে আমরা বলছি কাট অফ পয়েন্ট কারণ এই সময়ে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিলো। শিল্প বিপ্লবের আগে কার্বনের কনসেন্ট্রেশন ছিল ২৮০ পিপিএম যা ১৫ ডিগ্রী গড় তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯৯০ এ এসে সেটা হয়ে গেল ৩৫৩ পিপিএম অর্থাৎ মাত্র ১৫০ বছরে সেটা কতগুণ বেড়ে গিয়েছিলো! কার্বন যখন প্রকৃতিতে চলে আসে তখন সেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। আর এটি তাপকে পৃথিবী থেকে আর বের হতে দেয় না। ফলে এটি সমুদ্রপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে মেঘ তৈরি করে যা থেকে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এছাড়াও অতিবৃষ্টি হয়, কয়েকদিন আগে কেরালায় যে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিলো তাতে ১৫ দিনে ক্ষতি হয়েছিলো প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার। ঢাকা শহরে যদি দুদিন একটানা বৃষ্টি হয় তাহলে একতলা বাসাগুলো ডুবে যাবে কারণ আমাদের সবগুলো আউটলেট আবদ্ধ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে একটা সম্ভাব্য চিত্র।

এখন দেখব কোন জায়গা থেকে কার্বন নিঃসরণ সবচেয়ে ভয়াবহ। এখানে আমরা চারটি তথ্য দিয়েছি অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড যেখান থেকে নিঃসরণ হচ্ছে তার ৩৩.৩% আসছে কৃষি থেকে, এনার্জি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছে ১৯.৩%, ট্রান্সপোর্ট থেকে ১৯.৮% এবং ঘরবাড়িতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছি সেখান থেকে আসছে ৯.৫%। তার মানে শিল্পায়ন হচ্ছে সব থেকে বড় কালপ্রিট বা কারণ যেটা বলেই অভিহিত করি না কেন শিল্পায়ন থেকে সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে যা থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস তৈরি হচ্ছে যা পৃথিবীতে তাপ ধরে রাখছে এবং সেটা থেকেই জলবায়ু সংকটের সূচনা। এটাই হচ্ছে এর নন-এক্সপার্ট নলেজ।



আমরা যদি শিল্পায়নকে থামাতে চাই সেটা সম্ভব হবে না। কারণ আমাদের জীবনের সাথে এটি সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে গেছে। শিল্পায়ন শুরু হয়েছিলো ব্রিটেনে আর সেটার ফলে সেখানে এভারেজ ইনকাম বেড়ে গেলো। এতে তাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেড়ে গেল, চিকিৎসার উন্নয়ন ঘটল এবং তাদের গড় আয়ু বেড়ে গেলো। ১৭৮১ সালে ইংল্যান্ডে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩৫ বছর আর ১৮৫১ সালে এসে সেটা হয়ে গেলো ৪০ বছর। সুতরাং শিল্পায়নকে পরিত্যাগ করা খুব কঠিন কাজ কারণ শিল্প হচ্ছে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। কিন্তু এটার একটা ডার্ক সাইডও কিন্তু আছে। শিল্পায়ন যখন হয়েছিলো তখন প্রচন্ড রকমের অসমতা তৈরি হয়েছিলো যেটা এখনও আছে। আমরা সামাজিক অসমতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি এই কারণে যে, এর পরে যখন আমরা সমাধানগুলো আলোচনা করব আমরা লক্ষ্য করব যে এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র বিজ্ঞানের মধ্যেই এই সমাধান নিহিত নেই বরং সমাজেও এর সমাধান নিহিত আছে। অর্থাৎ আমরা যদি সমাজের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়কে পরিবর্তন করি তাহলে বিজ্ঞানকে আমরা আরও মানবিক করে তুলতে পারব, আরও সহনীয় করে তুলতে পারব। ফলে যে সংকটটা তৈরি হয়েছে সেটা থেকে এখনও বের হওয়ার হয়ত সুযোগ আছে। এই অসম পৃথিবী হয়ত এই সংকটের একটা প্রধান কারণ।

এখানে একটা ঝুঁকির ব্যাপার আছে। কারণ আমরা দেখেছি যে, শিল্পায়নের সাথে সাথে পুঁজিবাদের উন্নয়ন ঘটেছে। আর এই শিল্পায়ন শুধু পুঁজিবাদী সমাজে হয়নি, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও হয়েছে। সুতরাং শিল্পায়ন কিন্তু মোটামুটি ভাবে একটি নিউট্রাল ইনপুট। অর্থাৎ পুঁজিবাদই শুধু শিল্পায়নের জন্য দায়ী সেই কথাটা এখন আর বলা যাচ্ছে না। কারণ যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ তৈরি হয়েছিলো সেখানেও কিন্তু পুঁজিবাদের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে আমরা লক্ষ্য করছি শিল্পায়ন এবং পুঁজিবাদ যুগপৎভাবে ডেভেলপ করেছে। কারণ শিল্পায়নের ভিত্তি যদি হয় পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদ যদি আমাদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থাকে নির্মাণ করে তাহলে সেটা তৈরি করে কাঠামো। যেমন ধরেন, এখানে সমস্ত জানালা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, তাহলে এসি বন্ধ করে আপনি থাকতে পারবেন না। এই জানালা বন্ধ করা রুমটা হচ্ছে এর কাঠামো। সুতরাং এই কাঠামো পরিবর্তন করতে না পারলে আপনি এসি বন্ধ করতে পারবেন না, একটা নরমাল ভেন্টিলেশন পাবেন না। অর্থাৎ আপনি যখন কোনও একটি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে একটি সমাজ কাঠামোকে নির্মাণ করেন তখন ওই সমাজ কাঠামো পরিবর্তন করা খুব কঠিন হয়ে যায়। যেমন এই মুহূর্তে এসি বন্ধ করতে গেলে জানালা খুলে দিতে হবে অর্থাৎ কাঠামো বদলাতে হবে। ঠিক একইভাবে পুঁজিবাদ যদি হয় শিল্পায়নের কাঠামোর প্রধান ভিত্তি তাহলে ঐ কাঠামোর মধ্যে থেকে শিল্পায়নকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর এর ফলেই হয়ত প্যারিস এগ্রিমেন্ট থেকে আমেরিকা বের হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা পুঁজিবাদী দেশ আস্তে আস্তে তাদের হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, তারা বুঝে যাচ্ছে তাদের করার আর কিছু নেই।

পুঁজিবাদ মানুষকে একরকম নেশাগ্রস্ত করে তোলে আর সেই নেশাটা হচ্ছে ভোগবাদ। সমাজতাত্ত্বিকেরা এটার উপর প্রচুর গবেষণা করেছেন যে পুঁজিবাদ কেন এখনও বেঁচে আছে। শ্রমিকের বেতন তো অনেক কম তাহলে শ্রমিক কেন পুঁজিবাদকে ভালবাসছে! কারণ সে স্বপ্ন দেখে; সে গাড়ির স্বপ্ন দেখে বাড়ির স্বপ্ন দেখে। আপনি আমি সবাই স্বপ্ন দেখি। সুতরাং পুঁজিবাদ সেই স্বপ্ন তৈরি করতে পারে। সেই স্বপ্নটা কোনদিন বাস্তবায়িত হবে কি না সেটা আমরা জানি না। অর্থাৎ এই ভোগবাদী স্বপ্নটা হচ্ছে পুঁজিবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান যেটা এখানে হোক বা পশ্চিমে হোক সব জায়গায় টিকে আছে। সুতরাং এই ভোগবাদ যদি পুঁজিবাদের কাঠামোগত প্রয়োজন হয় তাহলে এটা থেকে বের হওয়া খুব কঠিন।

আমরা এবার আসি যে বিজ্ঞানীরা তো জেনে ফেললো যে হ্যাঁ শিল্পায়ন হয়েছে, এর জন্য গ্রিন হাউজ গ্যাস তৈরি হয়েছে যার জন্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়েছে এবং তার জন্য জলবায়ু সংকট তৈরি হচ্ছে। এটা তারা অনেক আগেই জেনেছে এবং জেনে গিয়ে তারা রিসার্চ করা শুরু করল যে এর সমাধান আমরা কীভাবে বের করব। এখানে গ্লোবাল যে এক্সের প্রয়োজন সেখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন্স। তারা এখানে যে পদক্ষেপ নিল সেটা নিয়ে তারা ১৯৮৮ সালে ‘ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ’ এর মত একটা অত্যন্ত শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করল। এটা তৈরি করে তারা প্রচুর পরিমাণ গবেষণা শুরু করল এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই তারা একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করল অর্থাৎ তারা বলল আমরা গবেষণা করেছি এখন আমাদের একটা নির্দেশনা দরকার। সেটাকে তারা নাম দিল ইউএনএফসিসিসি অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ফর দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ। অর্থাৎ যে সংকট তৈরি হয়েছে সেটা থেকে আমরা কীভাবে মুক্ত হব, শিল্পায়িত ও অশিল্পায়িত দেশগুলোর এখানে কী দায়িত্ব হবে এরকম বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে তারা পলিসি প্রেসক্রাইব করল এবং একটার পর একটা মিটিং করা শুরু করল। ২৪ টা মিটিং তারা করেছে এই পর্যন্ত। ১৯৯২ তে আর্থ সামিট, ১৯৯৫ এ প্যারিস এগ্রিমেন্ট, তার আগে কিয়োটো প্রোটোকল ইত্যাদি হচ্ছে বিভিন্ন চুক্তিনামা যেখানে পৃথিবীর শিল্পায়িত বা অশিল্পায়িত ও মাঝারি শিল্পায়িত দেশগুলো মিটিং করে চুক্তি করেছে যে কীভাবে তারা কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারবে। তারা শুরুর দিকে কার্বন নিঃসরণ মিটিগেশনের উপর আশাবাদী ছিল। আস্তে আস্তে তারা সেটা থেকে সরে আসছে যেটাকে আমি বলেছি আত্মসমর্পণ করছে। আমরা মিটিগেশন থেকে চলে গেছি অ্যাডাপ্টেশন, রিজিলিয়েন্স এবং লস এন্ড ড্যামেজ পর্যায়ে। আমি এটার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ আমরা কেন মিটিগেশনে থাকব না, যে কার্বন নিঃসরণের জন্য জলবায়ু সংকট তৈরি হয়েছে আমরা সেই কার্বন নিঃসরণকে কেন কমাতে চাইব না! কারণ কার্বন নিঃসরণ কমাতে গেলে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করে দিতে হবে কিংবা এমন কোনও প্রযুক্তি বের করতে হবে যেটা কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করবে বা সহনীয় মাত্রায় বের করবে। আমাদের একটা প্যারাডাইমেটিক শিফট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমরা মেনে নিয়েছি যে আমরা এটাকে আর কমাতে পারব না। ফলে আমাদেরকে এটার সাথে খাপ খাওয়াতে হবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর সাথে

অভিযোজন করতে হবে। আমরা সবচেয়ে ভয়ানক যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কার্বন ট্রেড। শিল্পায়িত সমাজগুলো বলছে, যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করছি সেটা হয়ত কমাতে পারব না কিন্তু তোমরা অর্থাৎ বাংলাদেশ এর মত দেশগুলো যেহেতু এখনও তত বেশি শিল্প তৈরি করনি, তোমরা আর তৈরি করো না ফলে কার্বন আর বাড়বে না বা একটু হলেও হয়ত কমবে। আর এজন্য তারা টাকা দেবে কম শিল্পায়িত দেশগুলোকে, কিন্তু তারা কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করবে না। অর্থাৎ তারা এই সংকটের রূপকে আরও ঘনীভূত করছে যেখানে আমাদের মত দেশগুলোর আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কি আসলেই কিছু করার নেই? এই চিন্তাটা করতে হবে এবং একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে।

আমি এবার আপনাদের দৃষ্টি অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের আসলে দুটো সংকট। বাংলাদেশ এখনও কৃষি নির্ভর একটি দেশ যদিও এটির অন্যান্য আরও অনেক দিকে উন্নয়ন হয়েছে। এদেশের ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে চাল লাগে প্রায় ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন যেটা আমরা বাংলাদেশে উৎপাদন করছি। ১৯৭১ সালে এর পরিমাণ ছিল ১১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশের মানুষ এখন মাছ খেতে পারছে, পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে আর সেটি সম্ভব হয়েছে সবুজ বিপ্লবের কারণে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবও যেহেতু প্রযুক্তি, এর মধ্যেও যেহেতু ব্যবসা ঢুকে গেছে ফলে এটিও আমাদের মধ্যে কিছু সংকট তৈরি করেছে। বাংলাদেশের কৃষি এখন দুটি সংকটের মুখোমুখি, একটি হচ্ছে সবুজ বিপ্লব থেকে তৈরি হওয়া সংকট আর অন্যটি হচ্ছে জলবায়ু থেকে তৈরি হওয়া সংকট। সবুজ বিপ্লবের ফলে আমরা রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করি যেটা জমির উর্বরতা কমিয়ে দিচ্ছে। আমরা সেচ ব্যবহার করছি যার ফলে মাটির নিচ থেকে ক্ষতিকর জিনিস উঠে আসছে যেমন আর্সেনিক একটা বড় সংকট বাংলাদেশের। ফলে বাংলাদেশকে সবুজ বিপ্লব ও জলবায়ু উভয়ের যে সংকট তৈরি হয়েছে তা মোকাবেলা করতে হবে। আর তার সাথে তৃতীয় মাত্রা হিসেবে পুঁজিবাদ যখন এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা সেখান থেকে বেরোতে পারছি না। আপনি যখনি টাকা খাটাচ্ছেন, যেমন গাড়ি বানাচ্ছেন আর গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়। রাসায়নিক সার বানাচ্ছেন সেটা হোক নাইট্রোজেন বা অন্য যেকোনো সার, আপনি টাকা বিনিয়োগ করে ফেলেছেন। এখন আপনি এই কারখানা চাইলেও বন্ধ করে দিতে পারবেন না কারণ এতে প্রচুর পরিমাণ লোক বেকার হয়ে যাবে যেটা একটি বড় সংকট। বাংলাদেশে সাতটি কারখানা আছে যেগুলোকে বলা হচ্ছে গ্রিন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, বলা হচ্ছে সেখানে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে যেন তা আর কার্বন নিঃসরণ না করে।

এই অবস্থায় আমাদের কাজ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি তৈরি করা যেটা কার্বন নিঃসরণ করে না। কিন্তু যারা এটি নিয়ে কাজ করছে তারা বলছে আমাদের অন্য চিন্তা করতে হবে। তারা বলছে ‘ডিগ্রোথ’ অর্থাৎ নতুন কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের তৈরি করতে হবে যেটাতে ভোগবাদ, পুঁজিবাদ থাকবে না। যারা পরিবেশবাদী সক্রিয় কর্মী তারা বলছেন আমাদের যে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক মডেল

তা হতে হবে ডিগ্রোথ ভিত্তিক অর্থাৎ জিডিপিকে আপনি ফোকাস করে আর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি করতে পারবেন না। আপনাকে ভোগ কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে তবে তার মানে এই নয় যে ব্যক্তিগত কল্যাণ কমিয়ে আনা। এখানে দুটো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ, কল্যাণ এবং ভোগবাদ দুটো কিন্তু এক ব্যাপার নয়। ভোগবাদ হচ্ছে এসি, আর কল্যাণ হচ্ছে প্রাকৃতিক বাতাসে টিকে থাকা। সুতরাং ডিগ্রোথের কথা যারা বলছে তারা বলছে কল্যাণের দিকে আপনি তাকান। অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকবে কিন্তু ভোগ বা বিলাসিতা থাকবে না। আপনার জীবনের ফোকাসটাকে পরিবর্তন করতে হবে। যদি আপনার জীবনের আউটলুক চেঞ্জ করতে হয়, যদি আপনাকে নেচারের মধ্যে থাকতে হয়, কালচারের মধ্যে থাকতে হয়, পরিবারের মধ্যে থাকতে হয়, সেটা হচ্ছে প্রধান ফিলসফিকাল বা দার্শনিক আউটলুক। তার মানে এটি হচ্ছে বিজ্ঞানের সংকটের চেয়ে বরং একটি দার্শনিক সংকট। সুতরাং সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টাতে হবে।

আরেকটি কনসেপ্ট হচ্ছে র‍্যাডিকেল ইকোলজিকাল ডেমোক্রেসি। আমরা যদি আমাজনের ব্যাপারটা দেখি, আমাজনে আগুন লাগল কারণ আমাজন পুড়িয়ে ওখানে কৃষিজমি বের করতে হবে, আমাজনের কাঠ বিক্রি করতে হবে। কিন্তু আমাজনে যে আদিবাসী বাস করত তার সাথে আমাজনের কোনও দ্বন্দ্ব নেই, দ্বন্দ্ব আছে পুঁজির আমাজনের সাথে। আমরা যারা শহরে বাস করি আমাদের সাথে আমাজনের দ্বন্দ্ব কিন্তু ওইখানে যে আদিবাসী তার কিন্তু ভোগ নাই, তার বেঁচে থাকা রয়েছে। কারণ সে জীবনকে উপলব্ধি করে, জীবনের ভেতরে যে শক্তি আছে সেই শক্তি সে উপলব্ধি করে। সুতরাং আমাদের জীবনের ভেতরের শক্তিটা উদঘাটন করতে হবে এবং সেই শক্তির ভেতরে বেঁচে থাকার রসদটাকে খুঁজতে হবে। কিন্তু আমরা যদি জীবনের রসদটাকে ভুলে গিয়ে কৃত্রিম রসদের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে কিন্তু জলবায়ু সংকট থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে।

আমার উপসংহারটা হচ্ছে, আমরা শিল্পায়ন দিয়ে জলবায়ু সংকট তৈরি করেছি, শিল্পায়নের সঙ্গে পুঁজিবাদকে যুক্ত করেছি, পুঁজিবাদ হয়ে গেছে আমাদের কাঠামো এবং এই কাঠামো থেকে বের হওয়া খুব কঠিন। সেক্ষেত্রে আমাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টাতে হবে, আমাদের অন্যান্য সামাজিক অসমতা কমাতে হবে এবং জীবনের ভেতরের শক্তির মধ্যে যেতে হবে। এখানে দুভাবে কাজ করতে হবে, এক হল আপনি কাঠামোকে পরিবর্তন করতে পারেন যেখানে আপনার রাষ্ট্রকে লাগবে, কর্পোরেট ক্যাপিটালের সহযোগিতা লাগবে। আরেকটা হচ্ছে সাধারণ জনগণ দলীয়ভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। পুঁজিবাদের ভেতরে থেকে সংকট মোকাবেলা করা একটা চ্যালেঞ্জ। এখানে আমি বলছি না সমাজতন্ত্রই একমাত্র পথ, এখানে আমাদের জীবনমুখী যে দর্শন সেটার চর্চা করতে হবে এবং তার মধ্যে থেকেই আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে যেখানে আমরা কল্যাণের দিকে তাকাবো, ভোগের দিকে তাকাবো না।

**নির্ধারিত আলোচক : অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন, ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার
ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনা একটি সমন্বয়যোগী আলোচনা। বাংলাদেশ যেহেতু কৃষিনির্ভর একটি দেশ, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব সেটা আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ করেছি এবং দেখছি যে কীভাবে আমাদের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা দুর্ভোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন দুটোকে একসাথে মেলাতে চেষ্টা করি কারণ বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কথা বলেছেন যে পরিবর্তনের সাথে এটার সংযোগ আছে। দুর্ভোগের যে ঘনঘটা অর্থাৎ সময়ে আসছে না, অসময়ে আসছে অথবা পরে আসছে। আমরা যদি ঘূর্ণিঝড়ের কথা বলি যেমন



অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন

মহাসেন, ফণী এবং তারপর খুব কম সময়ের ব্যবধানে আমরা বুলবুলকে দেখেছি। এটা যদিও বিজ্ঞানের প্রমাণের ব্যাপার তারপরও যদি আমরা জলবায়ু পরিবর্তন সাধারণ মানুষের জ্ঞান থেকে প্রত্যক্ষ করি যেমন, কৃষকরা কিন্তু এভাবে বলবে না। কিন্তু তারা যে পরিবর্তনটা অনুভব করছেন সেই বিষয়টা কিন্তু ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আগে থেকেই ভবিষ্যৎ ধারণা দিয়েছেন যে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কারণ শতকরা ৪০ ভাগ দেশ যারা এই দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করছে যাদের ২২ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমরা যদি জীববৈচিত্র্যের কথা বলি তাহলে তার মধ্যে কৃষি এক নম্বর অবস্থানে আছে আর খাদ্য নিরাপত্তার সাথে কৃষি জড়িত। মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা। আমরা দেখছি যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে এবং এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য পৃথিবীর খাদ্য যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে ম্যালথাসিয়ান থিওরি কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ মানুষের খাদ্য যোগান দেয়া যাচ্ছে।

সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হচ্ছে। এখন যে স্মার্ট এগ্রিকালচার শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু আগে ছিল না। কিন্তু সব স্মার্টই কি পজিটিভ? না, সবসময় নয়। সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তাকে নষ্ট করে দেবে, মাটির উর্বরতা ও গুণাগুণকে নষ্ট করে দেবে সেটা কিন্তু আমরা চিন্তা করিনি। আমেরিকাতে ‘ডার্ট ডাজেন’ নামের যে কেমিক্যাল গুলো ব্যান করা হয়েছিলো সেগুলো বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ফলে এই যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে রাজনৈতিক অর্থনীতি সেটা আমরা বলতে পারি শুরু হয়েছিলো সেই সবুজ বিপ্লবের সময় থেকেই। তখন যে

জৈবিক উপাদান ছিল মাটিতে সেগুলো কিন্তু একদিনে নষ্ট হয়নি। রাসায়নিক ও কীটনাশকের মাধ্যমে জমির উপর খাদ্য উৎপাদনের চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেখানে গোচারণভূমি ছিল সেগুলো আমরা নষ্ট করে দিয়েছি কৃষির জন্য আর তারপর সেই কৃষিজমিকেই শিল্পের অবকাঠামো নির্মাণ করতে ব্যবহার করেছি। উলরিশ বেক নামে একজন জার্মান তাত্ত্বিক ১৯৮৬ সালে ‘রিস্ক সোসাইটি’ নামে একটি বই লিখেছিলেন যেটার পরে আমরা ‘আওয়ার কমন ফিউচার’ নামে একটি বই পাই যেটা ব্রান্টল্যান্ড কমিশন থেকে রিপোর্ট হিসেবে বের হয়েছিলো। সেখানে বলা হয়েছিলো আমরা কি কৃষিনির্ভর দেশগুলোকে দায়ী করব জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নাকি শিল্পায়িত দেশগুলোকে দায়ী করব। তখন দেখা গেলো যে পরিবেশ-প্রতিবেশকে সরাসরি কিন্তু শুধু শিল্পায়নের সাথে জড়িত করা যাবে না। আমরা যারা জমির উর্বরতা নষ্ট করছি, পানি দূষিত করছি তারাও কিন্তু এক্ষেত্রে দায়ী। অর্থাৎ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মিশ্রিত দূষিত পানি আমরা নদীতে ফেলছি, যা সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। ফলে সারা পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিটা আমরা নিয়ে আসছি।

সুতরাং খাদ্য সংকট কাটানোর জন্যই কিন্তু এসব করা হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে ভোগবাদী জীবন যাপনের জন্য। আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে কিন্তু এখনও পুষ্টিহীনতা হচ্ছে, শিশুরা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে না। ২০১০ সালে আমরা “ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি এন্ড নিউট্রিশন সারভিলেন্স” এ একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিলাম। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু দশ লক্ষ পরিবারে শতকরা ৬০ ভাগ শিশু খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছে। সুতরাং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে যে আমরা সবার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছি এমনটা কিন্তু নয়। মা যেহেতু খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ফলে শিশুও ভুগছে। এই ডাইভার্সিটি গুলো আমাদের দেখতে হবে।

প্যারিস এগ্রিমেণ্টে যে বিষয়টা ছিল তা হচ্ছে, নেচারের সাথে ট্র্যাডিশনাল নোশনটা নিয়ে আসতে হবে। ইকোফ্রেন্ডলি, গ্রিন টেকনোলজি এসবের সাথে আমরা পরিচিত। ১৯৮৩ সালে সব শিল্পায়িত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে বলা হল। আমরা কিন্তু নিঃসরণ কমাতে পারব কিন্তু মিটিগেশন করতে পারব না। মিটিগেশন হচ্ছে জিরো কার্বন নিঃসরণ যেটা সম্ভব নয়। মিটিগেট করতে পারব যদি আমরা এর প্রভাবকে মিটিগেট করতে পারি। ১৯৮৩ সালে বলা হয়েছিল পলিউশন কন্ট্রোল ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে আর এটা তারা শিল্পপতিদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ এখানে কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি। আপনাদেরকে আরেকটি আর্টিকেল রেফার করছি ৭.৯ E, সেখানে ক্লাইমেট জাস্টিসের মূলে রয়েছে ইকোনমিক ডাইভার্সিফিকেশন। সেখানেই অ্যাডাপ্টেশন, সেখানেই রিজিলিয়েন্স। আমাদের বাংলাদেশে বুলবুল আক্রান্ত এলাকায় মধ্য ’৯০ এর দশক থেকে সেখানে আমন ধান আর হচ্ছে না যেটা আমাদের প্রধান শস্য ছিল। শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদন তখনই কমে গিয়েছিলো। নতুন নতুন শস্যের বৈচিত্র্য আসলে মানুষই করেছে তাদের জীবিকার জন্য। ‘সাস্টেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস’ অর্থাৎ আমার টেকসই যে

প্রাকৃতিক সম্পদ আছে ওটাকেই একটু ডাইভার্সিফাই করে যে ফসলগুলো এখানে উৎপাদন করা সম্ভব তা করি। এটাকেই বলা হচ্ছে স্মার্ট এগ্রিকালচারের প্রধান লক্ষ্য। এটাই বিভিন্ন গবেষণাগারে রিসার্চ করা হচ্ছে।

রিইব মূলত অংশগ্রহণমূলক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা করছে। আমরা কটন নিয়ে কাজ করি। কটন প্রোডাকশন কিন্তু বাংলাদেশের অনেক এলাকায় সম্ভব। কিন্তু দেখা যায় যে, মনোপলি কয়েকটা জায়গায় তুলা উন্নয়ন হয়। আমরা কেন দেশের সব জায়গায় এটি ছড়িয়ে দেই না? আমি যদি হাইব্রিডটাকে ইকোফ্রেন্ডলি করতে পারি তাহলে আমার উৎপাদনটা কিন্তু বেশি হবে। কৃষিকে শুধু আমাদের খাদ্য উৎপাদন হিসেবে দেখলে হবে না, কৃষিকে দেখতে হবে একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কৃষি মানে আমার ফরেস্ট্রি, কৃষি মানে আমার মাছ চাষ, গবাদি ও হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি মানে সবচেয়ে বড় অর্থে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি ও হোমস্টিড গার্ডেন। আমরা যেন ডাইভার্সিফাইড ইকোনমির দিকে যাই, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবটা যেহেতু বন্ধ করা বা কমানো আমাদের হাতে নেই তাই আমাদের অভিযোজনটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আগে আমরা কোপিং বলতাম, তারপর বলেছি অ্যাডাপ্টেশন আর এখন বলছি রিজিলিয়েন্স। তারপরেও আমরা যে সংকটের মধ্যে আছি তা মোকাবেলা করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

**নির্ধারিত আলোচক : ড. মো: নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার,
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, (বারি)**

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষি হচ্ছে বৈশ্বিকভাবে কার্বন নিঃসরণের অন্যতম ক্ষেত্র। পাশাপাশি অন্যান্য সেক্টরগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখছে সেগুলোও দেখতে হবে। আমাদের প্রধান বক্তা বলেছেন শিল্পায়ন ও ভোগবাদের কথা এবং এটার বিকল্প কোনও উদাহরণ কিন্তু আমরা পাইনি। এখানে তিন ধরনের ইস্যুর কথা আমি বলতে চাই- পলিটিকাল, কালচারাল ও সায়েন্টিফিক ইস্যু। পলিটিকাল থেকেই বাকিদুটো ইস্যু কিন্তু এসেছে।



আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে শিল্পায়নের বিকল্প আসলে কিছু নেই। শিল্পায়ন হচ্ছে কয়েকটি বিষয়ের মাইলফলক। যেমন আমরা বলছি যে কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের নামে কীভাবে বিপর্যয়টা ঘটল। তিনটা জিনিসকে বলা হচ্ছে সস্তা-নাইট্রোজেন, পানি ও সূর্যালোক। হেবার-বস দুজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন যে, বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেনকে কীভাবে অ্যামোনিয়া ফর্মে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু সেটা ব্যবহার করা শুরু হল

ড. মো: নাজিম উদ্দিন

মানুষ মারার কাজে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুবকদেরকে ধরে ধরে মারার জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যবহার করা হত। একটি সম্মেলনে এটা নিশ্চিত করা হল যে আমরা অ্যামোনিয়া দিয়ে মানুষ মারব না কিন্তু এটাকে কৃষিকাজে ব্যবহার করব। আরেকটা বিপর্যয় ছিল ডোয়ার্ফিজম বা ধানগাছ যেন লম্বা না হয় সেই প্রক্রিয়া। সবুজ বিপ্লবে এই অ্যামোনিয়া প্রয়োগের সুযোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা মনোক্রপিংয়ের দিকে গিয়েছি, যেটা সারা বিশ্বেই হয়েছে। মনোক্রপিং এর আউটপুটটা কি? আমরা বলছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জের মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে কার্বন, মিথেন এবং নাইট্রাস। আমরা হেভি ট্রাক্টর ব্যবহার শুরু করেছি। আগে পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা হত কিন্তু সেটা দিয়ে চাষ কম হয় বলে মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল নিয়ে আসার কথা বলা হল যেটা দিয়ে গভীরভাবে চাষ করা যায়। এখন কনজার্ভেশন এগ্রিকালচারের কথা বলা হচ্ছে যেখানে টিলেজ কম হবে ফলে যে কার্বন নিঃসরণের কথা বলা হচ্ছে সেটাও কম হবে। অর্থাৎ পৃথিবী একদিকে যাচ্ছে এবং আমরা যাচ্ছি উল্টো দিকে। এখানে উপায়টা হচ্ছে আমাদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, আচরণের ক্ষেত্রে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে অর্গানিক সার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে যে সমস্যা তা হচ্ছে গবাদি পশুর অপ্ৰতুলতা। সরকার বলছে এই পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু যারা সার উৎপাদন করছে তারা বলছে যে পশু কম থাকায় কম্পোস্ট কম পাওয়া যাচ্ছে ফলে সার উৎপাদনও কম হচ্ছে। এই বিতর্কের কারণে এখানে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে।

সারা বিশ্বে ০.৮ বিলিয়ন মানুষ ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে, কিন্তু ওভারনিউট্রিশনে রয়েছে ১.২ বিলিয়ন মানুষ যেটা প্রায় দিগুণ পরিমাণ। তাহলে এই অতিরিক্ত খাদ্য কীভাবে আসছে? অর্থাৎ এখানে ম্যানেজমেন্টের সমস্যা রয়েছে। চিনি আমাদের অত্যাবশ্যকীয় খাবার না হলেও সারা বিশ্বে প্রায় ২৫% জমি চিনি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকে যদি অর্ধেক জমিও দেয়া হয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য তাহলে কিন্তু খাদ্য সংকট অনেকাংশেই কমে যাবে। সুতরাং এসব বিষয় পলিসি মেকারদের মাথায় রাখতে হবে। আর স্মার্ট কৃষি যেটা চলছে সেটা মূলত বর্তমান কৃষির একটা নতুন নাম দেয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের আগের খাদ্য ব্যবস্থায় প্রায় ১৫০০ প্রজাতির স্টেবল ফুড সোর্স ছিল। এখন সেটা কমে মাত্র তিনে চলে এসেছে যেখান থেকে ৬০% খাদ্যশস্য আসে। আমাদের খাদ্যের যে ব্যাপ্তিটা আগে ছিল সেটা এখন সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারে কনজার্ভেশনের জন্য তো আলাদা জমির দরকার নেই, ডাইভার্সিটি বাড়ানো দরকার। গত কয়েকদিনে আমরা মিষ্টি আলু কয়জন খেয়েছি? অথচ মিষ্টি আলুতে প্রচুর ভিটামিন-এ এবং ফাইবার রয়েছে যা সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এটা সেভাবে খাই না। এই যে ভোগবাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি এখান থেকে বেরিয়ে না আসলে এবং লোকাল ফুডকে যদি আমি প্রোমোট করতে না পারি তাহলে গ্লোবাল যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারব না।

আমাদের দেশে প্রায় এক কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হল

ভাত আর বাংলাদেশে প্রায় ৮ হাজার ধরনের চাল ছিল। ‘লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’ নামে একটা বিষয় আছে চালের ক্ষেত্রে যেখানে বিআর-২৯ হচ্ছে হাই গ্লাইসেমিক রাইস। সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই সাস্টেইনেবল বা বিকল্প কৃষির কথা বলে। কিউবা একমাত্র দেশ যারা কৃষির ক্ষেত্রে সাস্টেইনেবল বা ইকোফ্রেন্ডলি প্রযুক্তি তৈরি করতে পেরেছে। আমেরিকা তাদের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দেয়া বন্ধ করে দেয়ার ফলে তারা বিকল্প দিকে গেলো। আমরা আশা রাখছি আমাদের দেশেও এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, কৃষি থেকে যে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে সেটার নেচার কিন্তু ভাল কারণ সেটা গাছের শোষণ উপযোগী। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে যে কার্বন নিঃসরণ হয় সেখানে এমন কিছু উপাদান থাকে যা গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে কার্বন নিঃসরণ সেখানে কোয়ালিটি কার্বন নিঃসরণ বা কম নিঃসরণ করা আর খাদ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান কৃষির উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পলিসি প্রণয়ন ও একশন ভিত্তিক ইস্যুগুলো যদি আমরা সেভাবে উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হবে বলে আমি মনে করি।

নির্ধারিত আলোচক : ড. মাহফুজুল হক, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে ইউএনএফসিসিসি, প্যারিস এগ্রিমেন্ট ইত্যাদিতে বাংলাদেশ সাইন করেছে। এগ্রিকালচার সিকিউরিটির ব্যাপারে ইউএনএফসিসিসি-তে বলা আছে যে আমরা এমন কোনও একশন নেব না যাতে করে কৃষি নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়। এখানে তিনটা জিনিস আমরা খেয়াল করার চেষ্টা করছি। একটা তো ছিল মিথেন এমিশন যেটা ওয়েট রাইস কালটিভেশনে তৈরি হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যদি মিথেন এমিশনের কথা বলে আমরা



ড. মাহফুজুল হক

এগ্রিকালচারকে দমিয়ে দেই তাহলে সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হবে আমাদের জন্য। কারণ এখানে তো কমার্শিয়াল ফান্ডিং হচ্ছে না। এখানে কম্যুনালা ফান্ডিং হচ্ছে বা স্মল হোল্ডারস্ যারা এগ্রিকালচারালিস্ট তারা এখানে ফান্ডিং করছে। এক্ষেত্রে এধরনের মিথেন এমিশনের অজুহাত দিয়ে আমরা ওয়েট রাইস কালটিভেশন বন্ধ করতে পারি না। আমরা গবাদি পশুকে দায়ী করতে পারি না মিথেন এমিশনের জন্য। যেখানে ইউরোপ বা আমেরিকাতে হাজার হাজার গবাদি পশু খামার তৈরি হচ্ছে সেখানে আমাদের দেশে স্মল হোল্ডার একটা বা দুটো গরু দিয়ে কি পরিমাণ মিথেন এমিশন করবে এগুলোও দেখার বিষয় যাতে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত না হয়।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা টিলেজ খুব বেশি করে করব নাকি কম করে করব। আমরা কম করে তো করতামই, আবার আমরা লাঙ্গলে ফেরত যাব কি না। এখানে এগ্রিকালচার গভর্নেন্সের একটি বিষয় আছে যেখানে ২০১৮ তে কৃষি নীতি এসেছে, ওয়াটার পলিসি এসেছে আর এফজিডি তো আছেই আগে থেকে। এই যে ডিবেটটা আছে যে আমরা কি ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারের দিকে যাব নাকি এগ্রো-ইকোলজির দিকে যাওয়া উচিত। আমি মনে করি রিইব থেকে এখানে বড় ভূমিকা পালন করার মত পর্যায়ে রয়েছে। এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্টরা যখন এগিয়ে আসবেন তখন পলিসি মেকাররা আরও সরব হবেন যে আমাদের আসলেই চিন্তা করতে হবে। কারণ আপনারা জানেন যে এগুলো নির্ধারণের সময় আমাদের উপর প্রচুর চাপ আসে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বা সীড, কেমিক্যাল ইত্যাদি কোম্পানিগুলো থেকে। সেই চাপগুলোকে আমরা ঠেকাতে না পেরে বাধ্য হয়ে আমাদের নীতিগুলো ও আইনগুলোতে আমরা আত্মসমর্পণ করি। আমরা এগ্রো-ইকোলজিতে গিয়ে ডেমো ফার্ম করতে পারছি কি না, কারণ কৃষক বলবে আমি তো আর পরিবেশ বুঝি না, সেইটা সরকারের চিন্তা। আমার দরকার চাষবাস, সেখানে আমাকে কেন বিপদে ফেলছেন! এগ্রো-ইকোলজিকে আমরা মেইনস্ট্রিম করতে পারব কি না এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা একটু জিম্মি হয়ে পড়ছি, এই জিম্মি দশা থেকে কীভাবে উত্তরণ পেতে পারি সেটার জন্য এই ধরনের বৈঠক অনেক ফলপ্রসূ হতে পারে বলে আমি মনে করি।





মুক্ত আলোচনা পর্ব

ড. এম শাহাব উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

আমরা কৃষি নিয়ে কিছু কাজ করেছি কিন্তু সেটা আসলে খুবই সীমিত। রংপুরের দুটো উপজেলায় এবং রাজশাহীর তিনটি উপজেলায় আমরা কাজ করেছি। আমাদের নিজস্ব কিছু প্রোগ্রাম আছে নাটোরে যেখানে মিনিমাম টিলেজে কৃষি সম্পন্ন করা যায়। এখানে কিছু শর্ত রয়েছে। যখন আমরা মিনিমাম টিলেজে বা জিরো টিলেজে এগ্রিকালচার করতে যাই তখন আগাছার প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি হয়। এখানে একটি আগাছানাশক ব্যবহার করা হয় যা মাটির জন্য ক্ষতিকর। এটা মিনিমাইজ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করা হয় যাতে মাটিতে যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো আছে যেগুলো বিনাশ হবে সেগুলো যেন কিছুটা হলেও সক্রিয় হয়। আর সীডের ক্ষেত্রেও আমরা কিছু কাজ করেছি। যেসব রাইস ভ্যারাইটিজ আছে সেগুলো আমরা পপুলার করতে চাচ্ছি যাতে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারি বিশেষ করে হাওড় এলাকায়। বারি থেকে কিছু হিট টলারেন্ট, স্যালাইন টলারেন্ট ভ্যারাইটি রিলিজ হয়েছে যেগুলো আমরা দক্ষিণের এলাকাগুলোয় প্রোমোট করার চেষ্টা করেছি। আমরা ড্রট রেজিস্ট্যান্ট, সাবমার্জ রেজিস্ট্যান্ট কিছু ভ্যারাইটি প্রোমোট করেছি। ধান, গম ও পাটের বীজ উৎপাদনের জন্য আমাদের কিছু কার্যক্রম রয়েছে যাতে করে কৃষক নিজের বীজ নিজেই উৎপাদন করতে পারে। আমরা তাদেরকে এমন কিছু কন্টেইনার দিয়েছি যাতে করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও তারা বীজ সংরক্ষণ করতে পারে।

আমরা কিছু প্রযুক্তি অ্যাপ্লাই করেছি যেমন ভাসমান বেডে সবজির চাষ। এটা প্রায় দেড়শ থেকে দুশো বছরের পুরনো একটি প্রযুক্তি। এই ভাসমান বেডে আমরা বিভিন্ন রকম ধানের চারা উৎপাদন করে থাকি।



ড. এম শাহাব উদ্দিন

ইদানীং আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি ধানের চারার পাশাপাশি কিছু মসলা ও ঘাসের চাষও করব। আমরা চাচ্ছি গরুর গোবরকে ব্যবহার করে ওটা দিয়ে ভার্মিকম্পোস্ট, ট্রাইকোকম্পোস্ট তৈরি করব। আগে কিন্তু শুধু চট্টগ্রামে আগাম সবজি চাষ হত। এখন খুলনার মাছের ঘেরে এবং খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকার প্রত্যেকটি ধানের ক্ষেতে আগাম সবজি চাষ করছে। আর এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে তারা মিনিমাম কীটনাশক ব্যবহার করছে। আমাদের হাইব্রিড শস্য ইদানীং খুব বাড়ছে যেমন টমেটো। আমরা চেরি টমেটোর প্রতি বেশি জোর দিচ্ছি। ‘অল্টারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং মেথড’ যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে মিনিমাম পানি লাগে কিন্তু বাম্পার ফলন হয়। এই পদ্ধতিটি আমাদের প্রমোট করতে হবে। আমাদের যত ডিজেল ইঞ্জিন আছে সেগুলোকে আমরা সোলার ইঞ্জিনে কনভার্ট করার পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমাদের বিভাগ থেকে জৈব কীটনাশক প্রমোট করা হয়েছে। আমরা কৃষককে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে অবগত করার জন্য ‘পার্টিসিপেটরি ইন্টিগ্রেটেড ক্লাইমেট সার্ভিসেস ফর এগ্রিকালচার’ নামে একটি প্রোগ্রাম চালু করেছি যেখানে আবহাওয়ার বিষয়কে বিবেচনায় এনে কৃষকের কি করার দরকার তার সিদ্ধান্ত নিবে। আমাদের প্রত্যেকটি উপজেলায় দশ একর জমিতে সিনক্রোনাইজ কাল্টিভেশনের মাধ্যমে বোরো চাষের চিন্তা করেছি যাতে মিনিমাম পানি দরকার হয়। এখানে রিসোর্সগুলোর যথাযথ ব্যবহার হবে, কম কীটনাশক ব্যবহৃত হবে। এতে করে জলবায়ু সংকটকে মোকাবেলা করে আমরা কৃষিকে টিকিয়ে রাখতে পারি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।

শফিউল ইসলাম, প্রভাষক, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

আমি মূলত ড. নাজিম উদ্দিন এবং অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম স্যারের সূত্র ধরেই আলোকপাত করতে চাচ্ছি। তিনি বলেছিলেন কল্যান বনাম ভোগবাদ। এই পুঁজিবাদে আমরা আসলে ভোগবাদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। যেহেতু সবুজ বিপ্লব এবং আমাদের যে আধুনিকায়ন হচ্ছে সেই বিষয়টাতে আমরা এখানে এসে ঠেকে যাচ্ছি। যেহেতু ভোগবাদী বিষয়টা থাকবেই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় স্মার্ট এগ্রিকালচার বা কনজারভেশন এগ্রিকালচারকে আমাদের ক্লাইমেট ক্রাইসিসের আঙ্গিকে জোর দিয়ে দেখতে হবে। গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর মধ্যে মিথেন হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকেও বেশি ক্ষতিকারক। আর সেটা আসছে গবাদি পশু থেকে যা তাদের জাবর কাটা বা মল থেকে আসছে। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা হয়েছিলো যেখানে দেখানো হয় যে, এই যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে যে মিথেন গ্যাস তৈরি করছে যে ব্যাকটেরিয়া সেটাকে কীভাবে রিডিউস করা যায়।



শফিউল ইসলাম

আমরা তাদের খাবার নিয়ে গবেষণা করতে পারি যে কোন খাবারটা খাওয়ালে তাদের মিথেন গ্যাস কম তৈরি হবে ।

আমাদের যে বনাঞ্চল রয়েছে সেখানে আমরা দেখি যে দুর্বৃত্তরা এখান থেকে গাছ কেটে বন ধ্বংস করছে, আবার কৃষিজমি ও ঘরবাড়ির জন্যও বন উজাড় করছে । এটাকে আমাদের কমাতে হবে । পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরকে বনায়ন করতে হবে । আমাদের কৃষিতে স্টেবল ফুড বা ধানের উৎপাদন এখনও বেশি আছে কিন্তু একটা সময় তা থাকবে না । কারণ প্রফিট কম হওয়ায় অনেকেই এখন ধান উৎপাদন থেকে সরে আসছে । আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে ধানের উপরেই কারণ উঁচু জমিতে ধান চাষ হয়না । যদি দক্ষিণাঞ্চলের জমিগুলো তলিয়ে যায় তাহলে ধান উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে । সেজন্য ফুড ডাইভার্সিফিকেশন ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের উপর জোর দেয়া উচিত ।

শফিউল হাসান দিপু, পরিচালক, স্বস্তি লিমিটেডশ

আমি মূলত নিরাপদ সবজি বিপন্ন নিয়ে কাজ করি । সেই সূত্রে ধরে আমি বলতে চাই নিরাপদ সবজি আমরা কীভাবে চিনব, আমাদের কাছে ভোক্তা যারা আসেন তাদের একটি বড় প্রশ্ন এটা । সিলেট জেলা প্রশাসন তাদের প্রতিটা বাজারে একটা নিরাপদ সবজি কর্ণার করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন । আমি সুপারিশ করতে চাই এই ধরনের নিরাপদ সবজি কর্ণার যেন বাংলাদেশের সব জায়গায় করা হয় যাতে ভোক্তারা নিশ্চিতভাবে বিষ বা কীটনাশক মুক্ত শাকসবজি কিনতে পারে । আরেকটা বিষয় বলতে চাই



শফিউল হাসান দিপু

যে, বিজ্ঞানীদের সব কথা শোনার ব্যাপারে আরও একটু সতর্ক হতে হবে কারণ সব সময় তাদের পদক্ষেপগুলো ট্রায়াল ছাড়া সরাসরি প্রয়োগ করলে হয়ত ফলপ্রসূ নাও হতে পারে । বাণিজ্যিক কৃষির বিষয়টিও এসেছে । এক্ষেত্রে আমাদের যে ছোট খামার ভিত্তিক কৃষি ছিল এটাও কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে, বিদেশ থেকে গরু আমদানি করা হচ্ছে । আরেকটা বিষয় বাণিজ্যিক কৃষিতে ইদানীং আলোচনা হচ্ছে ভার্মি কম্পোস্ট, যেখানে দেশি কেঁচোর পাশাপাশি বিদেশ থেকেও কেঁচো আমদানি করা হচ্ছে । এই ব্যাপারে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার ।

মো: ইফতেখার আলী, সহযোগী প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব

আমাদের কৃষির ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই যেমন তুলা চাষের ব্যাপারটা, আমাদের দেশ একসময় কার্পাস বয়ন এবং তাঁতশিল্পে অনেক বিখ্যাত ছিল, পারস্যের স্মাট-স্মাজ্জীরা আমাদের

কাপড় পরতেন। ঐ সময় ব্রিটিশ শাসন চলে আসে, ব্রিটিশ গার্মেন্টসকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য আমাদের তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। উল্টো ব্রিটিশ গার্মেন্টসকে সাপোর্ট করার জন্য নীল চাষ করতে বাধ্য করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা দেশের কৃষির উপর অন্য দেশগুলো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের নিজের প্রয়োজনে। ব্রিটিশ শাসনের পরে এখন যে আমাদের বাংলাদেশ, এখানে আমরা দেখি যে অন্যরা আমাদের কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ



মো: ইফতেখার আলী

আরোপ করতে চায়। যেমন যেকোনো সংকট হলে ব্যবসায়ীদের জন্য খুব সুবিধা হয়। আমাদের উপমহাদেশে ব্যবসায়ী বা দালালি গোষ্ঠীর একটা বিকাশ হয়েছিলো বিশ্বযুদ্ধের সময়। এখনও যেহেতু জলবায়ু সংকট হচ্ছে, যারা আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তারা জলবায়ু সংকটের নামে যে বিভিন্ন প্রযুক্তি আমাদের দিচ্ছে যেগুলো আমাদের জন্য সাস্টেইনেবল বা উপযোগী কি না এই বিষয়টা আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। যেমন এখানে যদি আমরা একটা উদাহরণ দেই যে সোলার ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেচের কথা বলা হচ্ছে। ভূগর্ভের পানি তোলা এমনিতেই ক্ষতিকর, আর সোলারকে আমরা বলছি পরিবেশ বান্ধব। অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পরিবেশেরই ক্ষতি করা। এই ধরনের প্রযুক্তিগুলো নেয়ার আগে আমরা ভালভাবে ট্রায়াল দিচ্ছি না বা গবেষণা করছি না, এই বিষয়গুলো আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। আর জাতিসংঘ যেটা বলছে যে জলবায়ু সংকট মোকাবেলার জন্য স্থানীয় পরিবেশের রিজিলিয়েন্স বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে স্থানীয় পরিবেশের ইকোলজিকাল রিজিলিয়েন্স বৃদ্ধি করা। আর এটা হয় তখনই যখন এখানে অনেক জীববৈচিত্র্য থাকে। আমরা যদি সার বা কীটনাশক দেই সেখানে কোনও জীববৈচিত্র্য থাকবে কি না সেটা আমাদের ভাবতে হবে।

কাজী সোহেল রানা, নির্বাহী পরিচালক, ডিডিপি সিরাজগঞ্জ

আমরা গত বছর দুয়েক আগে কুড়িগ্রাম থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত একটি নৌকা দিয়ে পাড়ি দিয়েছিলাম এখানকার স্থানীয় জনগণের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে প্রভাব ফেলেছে সেটা দেখার জন্য। আমরা যেটা দেখেছি যে, এখন নদীর পাড়ের মানুষদের মাছ ধরার প্রতি আর উৎসাহ নেই। এখন সব মাছ চলে গেছে



কাজী সোহেল রানা

মাছ চাষীদের দখলে, তারা বিভিন্নভাবে পুকুরে বা কৃষিজমি কেটে মাছ চাষ করছে। যদিও এটা আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ তারপরও তারা করছে। ফলে চর এলাকার মানুষদের মাছ ধরার প্রতি আর আগ্রহ নেই। আবার অপরিবর্তিত ভাবে বাঁধ নির্মাণের জন্য পরিবেশের জন্য ব্যাপক হুমকি দেখা দিচ্ছে কারণ কৃষিজমিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, নদীর পাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে। নদীতে অবৈধভাবে ড্রেজিংয়ের কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের কৃষিজমির জন্য হুমকি তৈরি করছে। এতে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বাস্তুহারা হয়ে যাচ্ছে এবং তারা ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল মাইগ্রেশন করছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সিরাজগঞ্জ আমাদের তাঁতশিল্পের জন্য একটি বিখ্যাত জায়গা। সেখানে তাঁতের জন্য যে রঙ ব্যবহার করা হচ্ছে তা পানির লেয়ারের সাথে মিশে যাচ্ছে, এই রঙটা তারা পরিকল্পিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে না। গবেষণা এলাকায় অনেকের কাছে আমরা শুনতে পেয়েছি যে সেখানে প্রতিবন্ধিতা অনেক বেড়ে গেছে। আবার সেখানে অনেক ইটভাটা গড়ে উঠেছে যা কৃষিজমিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। অনেক মানববন্ধনও হয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। চলনবিল এলাকায় প্রচুর পরিমাণে শামুক নিধন করা হচ্ছে, সেগুলো বিভিন্ন হাঁস-মুরগির ফার্মে খাবার হিসেবে সরবরাহ করা হচ্ছে। শামুকের খোলস দিয়ে চুন তৈরি করা হচ্ছে। এভাবে আমাদের জীববৈচিত্র্য এখন হুমকির মুখে। সুতরাং এখানে আইন বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী।

আবিদ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি

আমাদের বিশ্বের যে উষ্ণতা এর পেছনে কারণ হিসেবে আমি প্রথমেই বলব আমাদের বিশ্ব নেত্রীবৃন্দের জেদের রাজনীতি, রেযারেশি, অসহিষ্ণু আচরণ, শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রভাবক রাষ্ট্রগুলোর সাথে সমঝোতা বা আপোষকামিতা। এই বিষয়গুলো আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। আমরা একদিকে বনায়ন করছি চরাঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে, এটার মাধ্যমে এলাকাগুলোকে রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু ২০ বছর পর দেখা যাচ্ছে এই অঞ্চলগুলোতে লোকালয় গড়ে উঠে বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ আমরা একদিকে বনায়ন করছি আবার সেগুলো নষ্ট করে ফেলছি।



আবিদ হোসেন

বজলুর রশিদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক কৃষক ফ্রন্ট

উন্নয়নের দর্শন এখানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোন দর্শনে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, কার জন্য উন্নয়ন সেটা দেখতে হবে। জনগণের জন্য উন্নয়ন নাকি কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের জন্য উন্নয়ন এটা দেখা



বজলুর রশিদ ফিরোজ

জরুরী। কৃষির ক্ষেত্রে এটা মানুষের জন্য কৃষি নাকি মুনাফার জন্য কৃষি সেটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই নীতিটা যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে যে সংকট সেটা আমরা মোকাবেলা করতে পারব। সবুজ বিপ্লবের বাইরেও আমরা যদি মোটা দাগে দেখি যে আমাদের যে আবাদি জমি আছে এবং সেগুলোর যে উর্বরতা সেখানে প্রতি হেক্টরে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল কৃষি সেটার মাধ্যমে ৫ টন খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। সেই হিসেবে আমাদের ৯০ লাখ হেক্টর আবাদি জমিতে ৪ কোটি টন খাদ্যশস্য খুব সহজেই উৎপাদন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে

সবুজ বিপ্লব বা হাইব্রিড প্রজাতির প্রয়োজন আছে কি না সেটা একটা দেখার বিষয়। এখানে যদি সেই উন্নয়নের দর্শনকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা উপকৃত হতে পারব। পাশাপাশি কৃষক সংগঠনসমূহ ও জনগণকেও উন্নয়নের সাথে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তৈরি করে দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আলতাফ হোসেন, এস এস ও, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

আমাদের প্রতিষ্ঠান জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় যে সমস্ত সাস্টেইনেবল কৃষি বা পরিবেশবান্ধব কৃষিতে সহায়তা করতে পারে সেগুলো সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। মূলত আমরা সয়েল এন্ড ল্যান্ড রিসোর্সেস এর ক্যাটাগোরাইজেশনের মাধ্যমে কৃষককে পরামর্শ দিয়ে থাকি কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে। আমাদের মূল কথা হল কৃষিক্ষেত্রে যে প্রযুক্তিগত দূষণ হয় সেটা যেন না হয় তার জন্য আমরা সুষম সার প্রয়োগ করার জন্য কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে থাকি। পরিবেশ দূষণ রোধ করে কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় সেদিকেও আমরা কাজ করছি। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিজমিতে স্যালাইনিটি কীভাবে কমানো যায় সেটার জন্য আমাদের রিসার্চ সেন্টারে আমরা গবেষণা করি। এর জন্য আমরা কিছু কিছু প্রযুক্তিও উদ্ভাবন করেছি। পার্বত্য এলাকায় মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করে সেখানে কীভাবে পরিবেশবান্ধব কৃষি উৎপাদন করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করছি।

এস.এম. সাইফি ইকবাল, সিনিয়র রিসার্চার, সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি)

পলিটিকালি সেন্সিটিভ একটা কন্টেন্ট আছে যে লস এন্ড ড্যামেজ। বর্তমানে আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছি যে অ্যাডাপ্টেশন আমরা আর করতে পাচ্ছি না, অ্যাডাপ্টেশন ক্রস করে এখন আমরা ফেস করছি

লস এন্ড ড্যামেজ। আকস্মিক বন্যার কারণে দেশের সিলেট অঞ্চলের ১.৫ মিলিয়ন টন হেষ্টিরের মত আমাদের কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে। আমরা যখন ২০১৫ সালে প্যারিস এগ্রিমেন্ট পেলাম সেখানে উন্নত দেশগুলো বলল আমরা তোমাদের লস এন্ড ড্যামেজ নির্দেশ করার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারব না। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে যেহেতু তারা কার্বন নিঃসরণ করে আসছে তাই এক্ষেত্রে কিন্তু তাদের দায়িত্ব নেয়া উচিত ছিল। তখন তারা আমাদের একটা উপায় বলে দিল যে তোমরা ইনস্যুরেন্সের মাধ্যমে তোমাদের ক্ষতিগুলোকে নির্দেশ কর। আমাদের বাংলাদেশে দুই ধরনের ইনস্যুরেন্স রয়েছে, একটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল আরেকটা হচ্ছে কীভাবে ইনস্যুরেন্সের মাধ্যমে আমরা কৃষককে সাহায্য করতে পারব।



এস.এম. সাইফি ইকবাল

ড. মাহফুজুল হক, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমরা বেঁচে থাকার জন্য কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে যাচ্ছি কি না, এই বিষয়টা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আমরা যে পলিসিগুলো করেছি, সম্ভবত আমরা বাণিজ্যিক কৃষির দিকেই যাচ্ছি। সরকারের লক্ষ্য যদি থাকে যে আমরা সাবস্টেনশিয়াল কৃষি থেকে কমার্শিয়াল কৃষির দিকে যাব তাহলে আমাদের আজকের এই আলোচনা খুব একটা কাজে আসবে না। পার্লামেন্টের সদস্যরা যদি বুঝতে না পারে যে কমার্শিয়াল কৃষি করতে যেয়ে আমাদের এখানে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তাহলে তো আমাদের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। রিইব এখানে এই বিষয়গুলোকে সমন্বিত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করতে পারে। এখন বিশেষ করে অনেক কৃষি বিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসছেন জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর বিষয়গুলো নিয়ে। ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারের নামে তাদেরকে ভুল বুঝানো কঠিন। হাইব্রিড সীড নিয়ে আমাদের যে ভুল ধারণা ছিল সেগুলো দিয়ে বিজ্ঞানীদের ভুল বুঝানো সম্ভব না। এই বিষয়গুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় পলিসি মেকারদের মাধ্যমে সেগুলোর দিকে ফোকাস করতে হবে।

মো: নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি)

জলবায়ু পরিবর্তনকে বন্ধ করা সম্ভব নয়। গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই যে দ্রুত পরিবর্তন এই জায়গায় আমরা একটা রেক দিয়ে এটাকে স্লো করতে চাই যাতে আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারি আর এক্ষেত্রে আমাদের একশনটা কি হবে সেটাই হচ্ছে মূল বিষয়। আমাদের আগামী দিনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমন আমরা কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছি আর সেটা ছাড়া কোনও উপায়ও নেই। অনেক পেশা যেমন জেলেদের সম্মান করা হয় না বলে এই পেশায় সহজে কেউ আসতে চায় না। কিন্তু এই পেশাগুলোকে ভালভাবে রেকগনাইজ করলে এখানে মানুষের আগ্রহ বাড়বে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কাছে আমার সুপারিশ থাকবে যে আগামীদিনের কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাদের যে প্ল্যানিং থাকবে সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুগুলো ভালভাবে যেন নির্দেশ করা হয়।

ড. এম শাহাব উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

আমি বলতে চাই কৃষিকে এখানে অবশ্যই লাভজনক করতে হবে নাহলে কৃষিতে মানুষজন আসবে না। আমাদের একটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান রয়েছে যে ২০৩০ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ এবং কৃষি যেন মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর হয় সেজন্য মিথেন নিঃসরণকে অত্যন্ত টেকনিক্যালি ম্যানেজ করতে হবে। আমাদের একটা প্রজেক্টই আছে শুধু ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির জন্য, সেখানে আমি যুক্ত করেছি যে ভার্মি কম্পোস্টের সাথে যেন অর্ধেক পরিমাণ ট্রাইকো কম্পোস্টও মেশানো হয়। পরিবেশকে রক্ষা করার জন্যই মূলত এটা করা হচ্ছে। আবার সোলার ইরিগেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এনার্জি ও ডিজেল সেভ হচ্ছে। এক্ষেত্রে আগের চেয়ে আমরা এখন ৩০% পানি সেভ করতে পারছি। জলবায়ু সংকটের কারণে আমাদের কৃষিতে যে প্রভাব পড়ছে তার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো পাবলিকেশনের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন নীতিগুলোর সুপারিশ লিখিত আকারে পলিসি মেকারদের দিতে হবে।

অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের প্রবন্ধটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যে সংকটটা তৈরি হয়েছে এটা কতটা বিজ্ঞানের সংকট নাকি কতটা সামাজিক সংকট। আমরা বলতে চেয়েছি এটা হচ্ছে সামাজিক সংকট, বিজ্ঞানের সংকট নয়। কেননা প্রাক-শিল্প সময়েও আপনি এই চাষাবাদ করেছেন। সেটা হোক সাবসিস্টেন্স বা অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে, সেটা ছিল প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু আপনি যখন সেই পুরো ডাইনামিকস চেঞ্জ করে দিয়ে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ করলেন এটার সাথে জনগণের উদ্ভূত খাদ্য যোগান দেয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি সেটা সোশালিস্ট, কমার্শিয়াল বা নন-কমার্শিয়াল মডেলে সেটা করতে পারেন। সুতরাং আপনি কীভাবে উদ্ভূত জনগণের খাদ্য যোগান দিচ্ছেন সেটার সাথে সাইন্টিফিক উদ্ভাবনের কোনও সম্পর্ক নেই। কমার্শিয়ালাইজেশন যদি সাইন্টিফিক উদ্ভাবনের প্রণোদনা হিসেবে থাকে তাহলে ভাল। কিন্তু কমার্শিয়ালাইজেশন যদি শুধু মুনাফার জন্য প্রণোদনা হয়ে থাকে তাহলে একটা ঝুঁকি রয়ে যায়। সেই ঝুঁকিটা হতে পারে যেমন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের বলতে হবে জলবায়ু সংকট বিজ্ঞানের জন্য নয় বরং বিজ্ঞানকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করেছি সেটার জন্য জলবায়ু সংকট। ফলে এই জায়গায় আমরা বড় ধরনের যদি একটা দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমরা কখন সোশাল রিমিডিগুলোর দিকে যাব। অর্থাৎ আমরা কল্যাণ চাচ্ছি নাকি ভোগবাদ চাচ্ছি। আমরা যদি কল্যাণ চাই আর আমরা যদি ভোগবাদ থেকে বেড়িয়ে আসি সেক্ষেত্রে আপনি যদি পুঁজির বণ্টনটা কল্যাণের দিকে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে প্রচুর পরিমাণ ভোগবাদ ভিত্তিক ইভান্স্ট আপনি বন্ধ করে দিতে পারবেন। সেই জায়গাটায় যদি আমাদের কৃষি গবেষকরা কাজ করতে চান যে, ভোগের জন্য কৃষি নাকি বেঁচে থাকার জন্য কৃষি, সেক্ষেত্রে একটি মেজর প্যারাডাইমেটিক শিফট দরকার হবে। সেই কারণে আমি বলছি, সাইন্স দিয়ে সাইন্সের সল্যুশন নাকি সোসাইটি দিয়ে সাইন্সের ক্রাইসিস সল্যুশন সেটা আমাদের দেখতে হবে।

সভাপ্রধানের বক্তব্য ও সমাপ্তি : ড. শামসুল বারি, চেয়ারম্যান, রিইব



ড. শামসুল বারি

আমরা প্রথমদিকে যখন এরকম আলোচনা করতাম, তার থেকে আমি মনে করি আমরা অনেক পথ এগিয়েছি। আমাদের চিন্তা ধারার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি সরকারি যে কর্মকর্তাগণ আছেন তাদের কথাবার্তায় আমূল পরিবর্তন দেখছি এবং অনেক আশান্তি হচ্ছি। সরকারি পর্যায়ে যে একত্রে কাজ করার মন-মানসিকতা তৈরি হয়েছে তা খুবই আশার। তাই রিইব এখানে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কি করতে পারে তা নিয়ে কাজ করবে। আসলে কোন কিছুই এককভাবে করা কষ্টসাধ্য, তারপর এমন একটা বিরাট ইস্যু নিয়ে। এই বিষয়ে যে আমরা ভিন্ন চিন্তা করছি তা কিন্তু না, কারণ আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য আমাদের সবারই প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।



সংযুক্তি-এক

ড. শামসুল বারি
মনিরুল ইসলাম খান
ড. মাহফুজুল হক
মাহবুবা নাসরীন

মো: জাহিদুর রহমান
আবিদ হোসেন
ড. শাহাব উদ্দিন
মো: জামিলুর রহমান
ড. মো: মায়ের উদ্দিন
মো: শাহিদুল ইসলাম খান
কাজি সোহেল রানা
রাজিয়া সুলতানা
এস.এম সাইফি ইকবাল
বজলুর রশিদ ফিরোজ
ড. মনজুরুল আলম মন্ডল

মো: গোলাম জিলানি হেলাল
শফিউল ইসলাম
মো: আলতাফ হোসেন
মো: ইউসুফ মেহেদী

মো: শফিউল হাসান দিপু
সুরাইয়া বেগম
ড. মো. নাজিম উদ্দিন
রুহি নাজ
মো: সায়েরুর রহমান
বাল্লি চিসিম তোড়া
মো: ইফতেখার আলী
উম্মে কুলসুম
রাশিদা আক্তার
কাজী দ্রাকসিন্দা জবীন
আঞ্জু আরা খাতুন
মো: আদনান মাসরুজ্জামান

চেয়ারম্যান, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও ফ্যাকাল্টি সদস্য, বিইউপি
অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড
ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা
প্রোগ্রাম অফিসার, এইড ফাউন্ডেশন
সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি
অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
উপ-পরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
চিফ সীড টেকনোলজিস্ট, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
নির্বাহী পরিচালক, ডিডিপি সিরাজগঞ্জ
শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র রিসার্চার, সিপিআরডি
সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক কৃষক ফ্রন্ট
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা
ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ
সহকারী অধ্যাপক, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রভাষক, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
এসএসও, মুন্সিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট
(বিসিসিটি)
পরিচালক, স্বস্তি লিমিটেড
প্রকল্প সমন্বয়ক ও উপ-পরিচালক, রিইব
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি
প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব
উপ বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
সহযোগী সমন্বয়ক, রিইব
সহযোগী প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব
ফিন্যান্স অফিসার, রিইব
প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব
মনিটরিং অফিসার, রিইব
মনিটরিং অফিসার, রিইব
সহযোগী প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব

সংযুক্তি-দুই

০৯.৩০ : নিবন্ধন ও চা

১০.০০ : স্বাগত বক্তব্য: সুরাইয়া বেগম, প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব

১০.০৫ : পরিচিতি পর্ব

১০.২০ : মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন: অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১১.০০ : নির্ধারিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য

ড. মাহবুবা নাসরীন, অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি
স্টাডিজ, ঢাকা

ড. মো. নাজিম উদ্দিন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

ড. মাহফুজুল হক, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও ফ্যাকাল্টি, বিইউপি

১২.০০ : মুক্ত আলোচনা

০১.০০ : সভাপ্রধানের বক্তব্য: ড. শামসুল বারি, চেয়ারম্যান, রিইব

০১.১০ : দুপুরের খাবার ও সমাপ্তি

সংযুক্তি-তিন

বিষয় : কেন্দ্রীয় স্কুলঃ কৃষি ও জলবায়ু সংকট

Central School on Agriculture & Climate Crisis



স্থান : সিসিডিবি হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার, ঢাকা

তারিখ : ০৬-০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯



প্রথম দিন

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি বিষয়ক আবাসিক স্কুলে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন রিইব-এর প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম। তিনি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)-এর পরিচিতি, উদ্দেশ্য এবং কাজ সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন রিইব বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে কয়েক বছর ধরে “প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রতিবেশ: শিক্ষণ এবং গণগবেষণা” শিরোনামে জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় প্রকল্পভিত্তিক কাজ করছে। তিনি জলবায়ু সংকট ও কৃষি বিষয়ক আবাসিক স্কুলের উদ্দেশ্য সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ে একটি বড় ইস্যু। কারণ এই পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের অধীন সকলেই। এই সংকটের জন্য মনুষ্য সমাজ ও তার কর্মকাণ্ড কম বেশি দায়ী, তাই মানুষেরই উচিত জলবায়ু যেন পরিবর্তিত না হয় তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনের রাজনৈতিক কারণ এবং প্রভাব স্পষ্ট জানা এবং এর দ্বারা কৃষি কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা জানতে এই স্কুল ভূমিকা রাখবে।

এই স্কুলে উপস্থিত ছিলেন রিইব-এর প্রকল্পভুক্ত তিনটি জেলা সাতক্ষীরা, বগুড়া ও নীলফামারী থেকে আগত কৃষক প্রতিনিধি, তিন জেলায় রিইব-এর কর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং এর দিল্লী অফিসের প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিনোদ কপ্তি। বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছে তাদের সাথে সংযোগ সাধন এবং তাদের চিন্তা ও কাজের আদান প্রদানও এই স্কুলের আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ক্লাস - ১

বিষয় : Socio-economic System & Climate Crisis

আলোচক : মনিরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



মনিরুল ইসলাম খান

সামাজিক পরিবর্তনকে দেখা হয় সমাজের বিবর্তন, উন্নয়ন, অগ্রগতি, বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে। একটি সমাজে যখন এই পরিবর্তনগুলো হয় তখনই সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর এই পরিবর্তনের সাথে প্রকৃতির একটা সম্পর্ক আছে যা এখন আমরা বুঝতে পারছি জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই জলবায়ু পরিবর্তন মানুষ এবং তার সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাই এখানে জলবায়ু পরিবর্তন সমাজ বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক জলবায়ু পরিবর্তনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কারণ সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন সময়ে মানুষ প্রকৃতিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যা

জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই পরিবর্তনের জন্য আমরাই দায়ী এবং এই দায় স্বীকার করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়াই হবে এই সময়ের জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত। এই সমস্যা কোন আঞ্চলিক সমস্যা নয়, কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বৈশ্বিক।

আমাদের সমাজ পরিবর্তনে যে উন্নয়নের চিন্তা তা অনেকটাই ইউরোপ কেন্দ্রিক হয়ে আছে। কারণ এই উন্নয়নে যে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করতে হয়, তা এই পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। তাই এখন প্রশ্ন আসে সমাজ, চিন্তা-চেতনা ও অর্থনীতি কতটুকু দায়ী এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তা এখন ভাবার সময় এসেছে। আমরা কোন ধরনের উন্নয়ন চাই সেটা নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার এখনি। কেননা এই উন্নয়ন মানব সমাজে অসমতা তৈরি করেছে, আর ইতিহাস থেকে দেখা যায় এই অসমতাই মানব সভ্যতার স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে দেয়।

সমাজ পরিবর্তনের যে পশ্চিমা ধারণা এসেছে, তার মধ্যে আধুনিকায়ন হচ্ছে অন্যতম। কিন্তু দেখা গিয়েছে এটি ক্যাপসুলের মত, বাইরের আবরণটা মিষ্টি হলেও ভিতরে তিতা। এই উপমহাদেশে ভারত বর্ষকে স্থিতিশীল সমাজ হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু আকবরের শাসন আমলে পৃথিবীর সমগ্র অর্থনীতির চার ভাগের এক ভাগ ছিল ভারতের অর্থনীতি। কিন্তু এখানে মূল সমস্যাটা ছিল শাসন ব্যবস্থায়।

পশ্চিম থেকে এখানের সমাজ ব্যবস্থা আলাদা ছিল, তা বোঝা যায় আমাদের কৃষক সমাজকে দেখলেই। এখানে স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা ছিল এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ছিল আলাদা। কিন্তু এখানের সৃষ্টিশীলতা পশ্চিমাদের চোখে পড়ে নি। তাহলে প্রশ্ন আসে পুঁজিবাদের জন্যই কি কেবল সৃষ্টিশীলতা?

যদি আমরা আদিম সমাজের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো এই সমাজ প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার ছিল। এখন দেখা হচ্ছে তারাই ছিল এই পৃথিবীর রক্ষাকারী। তাই এখন প্রশ্ন আসে তাদেরকে প্রিমিটিভ বলাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? অন্যদিকে দেখবো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন জলবায়ু সংকট তৈরিতে প্রভাব রেখেছে। এই সময়ে যত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে জলবায়ু সংকট তত বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে। কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পিছনে ছিল শিল্পায়ন। তাহলে একটা প্রশ্ন আসে যে, মুনাফার জন্য শিল্পায়ন হবে না উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন হবে? এটা নিয়ে ভাবা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা এটি এক অসমতামূলক অবস্থা তৈরি করেছে আমাদের সমাজে। আর আমাদের যে কল্যানমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে, সেটার উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদ ব্যবস্থার জন্য নতুন ক্রেতা তৈরি করা, সেখানে উদারনীতিবাদ অর্থনীতি হয়েছে মুনাফা কেন্দ্রিক। এর ফলে পুঁজিবাদ এবং পরিবেশবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান তৈরী হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই গ্রীণ হাউজ গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়েছে আমাদের পরিবেশে। আর তাই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। এখানে সামাজিক শিল্পায়ন উপযুক্ত বিকল্প হতে পারে।

সামাজিক শিল্পায়ন প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসে যে, পুঁজিবাদের কোন উপযুক্ত বিকল্প আছে কিনা? এখানে সামাজিক শিল্পায়নকেই এর বিকল্প হিসাবে দেখা হয়। কারণ শিল্পায়ন হলেই কার্বন নিঃসরণ হবে। তাই বিকল্প নিয়ে আমাদের এখনই ভাবতে হবে, যা মানব জীবনমানকে ব্যাহত করবে না, সমতা আনয়নে সহায়ক হবে।

উপস্থিত সবাই মনে করেন আমাদের বিকল্প ফুয়েল ব্যবস্থাপনার কথা ভাবতে হবে। আর এখানে বিজ্ঞানকে মার্কেট নির্ভর হলে হবে না, এখানে বিজ্ঞান হবে মানব কল্যাণের জন্য। কিন্তু বিজ্ঞান যখন পুঁজিবাদের জন্য কাজ করে তখন সেটা হয়ে যায় বিপদজনক। এই দিকে গ্রীণ প্রযুক্তি আবার কর্পোরেট রাজত্ব তৈরি করতে যাচ্ছে, যা আমাদের জন্য আরও বিপদ ডেকে আনবে। এটা মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞানের ভাল আর খারাপ দুইটা দিকই আছে, কিন্তু এটাও ভাবতে হবে

এখনকার বিজ্ঞানের চর্চা কতটা স্বাধীনভাবে হচ্ছে । বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বিকল্প চিন্তার জন্য সেভাবে বরাদ্দ থাকছে না । এখানে বরাদ্দ মুনাফা কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে, তাই প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হচ্ছে যেটা মুনাফা দিতে পারবে সেই কথা মাথায় রেখেই ।

সামাজিক পুঁজিবাদ এখানে প্রশ্নবিদ্ধ । পুঁজিবাদের প্রকৃতি অনুযায়ী, বিকল্প পুঁজিবাদের ধারণা টিকবে না বলে মনে করা হয় । কিন্তু কৃষক সমাজ এখানে একটা আইডিয়াল উদাহরণ হতে পারে । তবে এখানেও একটা প্রশ্ন কৃষক কেন শিল্পায়ন কৃষির (Industrial agriculture) দিকে গেল? কৃষক একটা সময় নিজের ভোগের জন্যই কেবল খাদ্য উৎপাদন করত, কিন্তু কেন সে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দিকে গেল? সে বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার । এখানে বর্তমান সময়ের বাজার অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, কারণ পুঁজিবাদ বেঁচেই থাকে ভোগবাদের মধ্য দিয়ে । কিন্তু এটা একটা শূন্যস্থান তৈরি করেছে, যা সামাজিক মর্যাদা তৈরিতে ধাবিত করেছে সবাইকে, আর এভাবেই মানুষের ভোগ বেড়েছে । কিন্তু এটা একটি হতাশার জগতে নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে এবং অনেক প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে মনের মধ্যে ।

ক্লাস - ২

বিষয় : Science of Climate Crisis & Global Nature

আলোচক : মো: শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী

সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরী রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি)

জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু বলতে সময়ের সাথে আবহাওয়ার গড় অবস্থানকে বোঝায় । অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানের ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে । আর এই জলবায়ুকে আরো পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হলে আমাদের সমগ্র জলবায়ু ব্যবস্থা (ক্লাইমেট সিস্টেম) বুঝতে হবে । এই ব্যবস্থায় সূর্য হচ্ছে সকল শক্তির উৎস, আর সেই শক্তি সূর্যালোক হিসাবে পৃথিবীতে আসে আর পৃথিবীর সামগ্রিক ব্যবস্থায় শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে, যা মানুষের জন্য বসবাসযোগ্য করেছে এই পৃথিবীকে । এই পৃথিবীকে তিনটি অংশে ভাগ করলে দেখা যায় সেখানে আছে - বায়ুমন্ডল, জীবমন্ডল



মো: শামসুদ্দোহা

এবং সমুদ্র। আর এদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর তাপমাত্রাকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে রেখেছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা তাই প্রায় 15° সেলসিয়াস, যদি এই ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে তা হত - 30° সেলসিয়াস। অর্থাৎ এই পৃথিবী আর মানুষের বসবাসযোগ্য থাকতো না। তাই জলবায়ুর পুরো সিস্টেমটা যদি দেখি তাহলে দেখবো এটি কোন একক বিষয় নয় বরং পুরো সিস্টেমের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক।

বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে আবহাওয়ার এই গড় অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। আর পরিমাপের জন্য তাপমাত্রা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক অর্থাৎ এই জলবায়ু পরিবর্তন এক অর্থে তাপমাত্রার পরিবর্তনকে বোঝায়। এর জন্য গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমনকে দায়ী করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং সিএফসি (সিএফসি-১১ ও সিএফসি-১২) গ্যাস সমূহ। হিসাবে দেখা যাচ্ছে শিল্পায়নের পূর্বে যেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ছিল ২৮০ পিপিএম, সেখানে শিল্পায়নের সময় (১৯৯০) হয়েছিল ৩৫৩ পিপিএম। এদিকে শিল্পায়নের পূর্বে যেখানে মিথেন নিঃসরণের পরিমাণ ছিল ০.৮ পিপিএম, সেখানে শিল্পায়নের সময় (১৯৯০) হয়েছিল ১.৭২ পিপিএম। শিল্পায়নের পূর্বে যেখানে সিএফসি-১১ নিঃসরণের পরিমাণ ছিলই না, সেখানে শিল্পায়নের সময় (১৯৯০) হয়েছিল ২৮০ পিপিএম। শিল্পায়নের পূর্বে যেখানে সিএফসি-১২ নিঃসরণের পরিমাণ ছিলই না, সেখানে শিল্পায়নের সময় (১৯৯০) ছিল ৪৮৪ পিপিএম।

দেখা যাচ্ছে এইসকল গ্যাসের নিঃসরণ শিল্পায়নের বৃদ্ধির সাথে বেড়েছে, যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। এই কারণে বিশ্ব জলবায়ুর অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে। আর গ্যাস নিঃসরণের জন্য যেহেতু শিল্পায়নকেই দায়ী করা হচ্ছে, তা মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্যই হচ্ছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে হলে মানুষকে নিজের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর যদি না করতে পারে তাহলে ২১০০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা বর্তমান গড় তাপমাত্রা থেকে 8° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। এখনি আমরা বিভিন্ন দুর্যোগের মাধ্যমে এর প্রতিক্রিয়াগুলো দেখছি। কারণ দেখা যাচ্ছে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমা উন্নয়ন রাজনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন:

বর্তমান উন্নয়নের মডেল অনেক বেশি অর্থনীতি নির্ভর। অর্থনীতি দিয়ে অন্যান্য সূচককে পরিমাপ করা হচ্ছে। তাতে সঠিক তথ্য আসছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক। তাছাড়া এই উন্নয়নের মডেল অনেক বেশি শিল্প ও কাঠামোগত পরিবর্তনের উপর নির্ভর। তাই এই উন্নয়নের পথে চললে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমানো যাবে না, যা আমাদেরকে আরো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সংকটের মুখোমুখি করবে। কিন্তু বৈশ্বিক উন্নয়নের রাজনীতির ফলে পৃথিবীতে গ্রীন হাউজ

গ্যাসের নিঃসরণ কমানো যাচ্ছে না। কারণ বর্তমান উন্নয়ন কাঠামোতে উন্নয়নশীল দেশ যদি কার্বন নিঃসরণ না কমায়ে তাহলে উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এখানে জলবায়ু পরিবর্তন কোন একক বিষয় নয়, এটাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, আর তখনই এর পিছনে নিহিত প্রকৃত বিষয়গুলো নজরে আসবে। কিন্তু মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরোধীরা জলবায়ু পরিবর্তন মানবসৃষ্ট এটা মানতে নারাজ, তারা এই পরিবর্তনকে প্রকৃতিগতভাবে নির্ধারিত বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। এখানে প্রত্যেক দেশ নিজের উন্নয়নের কথা ভাবতে গিয়ে, জলবায়ু পরিবর্তন বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে সরে যাচ্ছে। তাই এখানে উন্নয়নের দর্শনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দর্শনের পরিবর্তন জরুরী।

তাপমাত্রা ২° সেলসিয়াসের বেশি বাড়বে না এমন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতেই প্রকৃতি যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, সেখানে কেনইবা এই ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল? কারণ এখনো চুক্তি অনুযায়ী কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নই শুরু হয় নি সেখানে ২° ধরে আগানোটা বিলাসি চিন্তা হয়ে যায়। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু ভবিষ্যত নির্ভর সে জন্য এটি আরো বেশি রাজনৈতিক হয়ে যাচ্ছে। যদিও ১৯৯২ সালে কমিটি গঠন করা হয়েছে কিন্তু ৬০ বছর আগে থেকেই জলবায়ু পরিবর্তন যে হচ্ছে তা বলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া উন্নয়ন চিন্তার প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশের জন্য পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করাটাই যেন বিলাসিতা হয়ে গেছে। তাহলে এখন প্রশ্ন আসে আমরা কি করবো? ২০৫০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন করার সময় আছে, কিন্তু এখানেও শর্ত আছে যদি উন্নত দেশ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমায়ে তাহলেই এটা কাজ করবে। আর এটা তাদেরকে করতে হবে তাদের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা থেকে।

ক্লাস - ৩

বিষয় : **Science of Climate Crisis & Global Nature**

আলোচক : মোঃ শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী

সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরী রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (সিপিআরডি)

মনিরুল ইসলাম স্যার এর উপস্থাপনায় উঠে এসেছে জলবায়ু পরিবর্তন মানব সৃষ্ট। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান অনেক কম, তাহলে কেন আমরা নিজেদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করবো। আমরা যদি এখন পশ্চিমা দর্শনে নিজেদের উন্নয়ন করে যাই, তাহলে আন্তর্জাতিক মহলে আমাদের দাবি দাওয়া শক্তভাবে উপস্থাপিত হবে কিনা সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ।

বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের পর আমরা চিন্তা করেছি গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো। কিভাবে কমানো যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে কিন্তু এখানে যা করার কথা তার মূল দায়বদ্ধতা উন্নতদেশের; তাই উন্নতদেশের এখানে কাজ করার কথা। ২০০১ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নতদেশের এভাবে কাজ করার কথা ছিল যে, কিউটো প্রটোকল অনুসারে ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৫% গ্রীণ হাউজ গ্যাস কমানো। কিন্তু কমানোর মত কোন কাজ তারা করেনি এবং কমানি বরং দেখা গেল আরো বেড়েছে। আর তখনই গুরুত্ব পেল গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাব নিয়ে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সকল দেশের সমান সক্ষমতা না থাকায় একটা ফান্ড গঠন করা হল, যেখানে উন্নত দেশগুলো তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য টাকা দিবে। আর সেই টাকা ব্যয় হবে অন্যান্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ‘এডাপটেশন এবং মিটিগেশনের’ জন্য যখন দেখা গেল যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো যাচ্ছে না তখনই আসলো ‘লস এন্ড ডেমেজের’ মত কনসেপ্ট - যা কিনা অভিযোজনের উর্দে। ২০০১ সালের পর ন্যায্যতার ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেল। ফান্ড গঠনের মাধ্যমে এমন একটা অবস্থা তৈরি হল যে, উন্নত দেশগুলো টাকা দিলেই বেঁচে যাবে। উন্নত দেশগুলো তাদের মত করে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে যাবে, আর উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশকে অভিযোজনের জন্য টাকা দিয়ে যাবে।

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে আবার সিদ্ধান্ত হয় গ্রীণ হাউজ গ্যাস কমানোর, কিন্তু এখানে ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয় সব সদস্য রাষ্ট্রকে এখানে অবদান রাখতে হবে, সবাই নিজের প্রস্তাবিত লক্ষ্য অনুযায়ী গ্যাস নিঃসরণ কমানো। তাই এখানে ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার আর কোন সুযোগ থাকলো না। যেমন বাংলাদেশ প্রস্তাব করলো ৫% কমানো, আর যদি আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয় সেটা হবে ১৫% পর্যন্ত। কিন্তু বাংলাদেশ এখানে যা করেছে সেটা মূলত এনার্জি সিকিউরিটির কথা মাথায় রেখে, যেন বাংলাদেশের আমদানি খরচ কমানো যায়। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনের ক্ষেত্রে, কিন্তু অভ্যাসগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কতটুকু করা হয়েছে বা ভাবা হয়েছে তা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। আবার একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে, এটা কি কেবলি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব? মানুষ কি নিজের সদৃষ্টিয়া কিছু করতে পারে না? এখানে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু করার আছে। কিন্তু এটাও ঠিক জলবায়ু পরিবর্তন একটা বৈশ্বিক বিষয়, তাই সেখানে বিশ্বের সকল মানুষের সদৃষ্টিয়ার প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার এখন কার্বন ট্যাক্স বসানোর কথা ভাবছে, কিন্তু সেখানে আমাদের কার্বন ক্রেডিট থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন কার্বন ট্যাক্স দিব? তাছাড়া আমরা বেশি করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল কিভাবে তাহলে আমরা গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো? সেটা হতে পারে ভোগ কমানোর মাধ্যমে, প্যারিস চুক্তি

অনুযায়ী এর জন্য আমাদের একটা বাজার ব্যবস্থাপনা দাঁড় করানো দরকার। তাছাড়া এখন কার্বন ড্রেডিট বিষয়টি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ক্লাইমেট একটি ক্রসকাটিং বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। কেননা আমরা দিন দিন বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। প্রকৃতিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছি। যা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।

২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, ১৭% ভূমি হারাবে এই পৃথিবী। সমুদ্রে তাপমাত্রা বাড়ার ফলে ঘন ঘন সাইক্লোন হচ্ছে। এখন সময় এসেছে দুর্যোগের সংজ্ঞা পরিবর্তন করার।

ক্লাস - ৪

বিষয় : Climate Crisis, Gender & Ethnic Minorities

আলোচক : ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, নির্বাহী পরিচালক, রিইব



মেঘনা গুহঠাকুরতা

বাংলাদেশের কৃষকের মাঝে ছোট এবং মাঝারি কৃষকই ৮৪.২৭%, যাদের আওতায় রয়েছে মোট চাষযোগ্য জমির ৪৬.১২%। কিন্তু শ্রমের সৃষ্ট বন্টনের জন্যই এই কৃষক দ্বারাই অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। আবহাওয়াগত পরিবর্তনের কারণে প্রকৃতি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মেশিন নির্ভর সেচ ব্যবস্থা হয়েছে। এই দিকে কৃষি নির্ভর গৃহস্থালির সংখ্যা কমে গেছে। তাছাড়া রাষ্ট্রের বুরোক্রোটিক দুর্বলতার কারণে পুঁজিবাদ সেভাবে বিকশিত হয়নি। এইদিকে কৃষি

উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে রয়েছে শ্রম বন্টন, পুঁজির প্রবাহ, পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি। বর্তমান সময়ে শ্রম বন্টন ব্যবস্থা আরো বেশি বিভাজিত হয়ে পড়েছে। বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থা আরো নতুন মাত্রা পেয়েছে, সমাজ বিভিন্ন নতুন মাত্রায় আরো বেশি বিভাজিত হয়ে পড়েছে। আর এর মাধ্যমে তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণায় সামাজিক পরিবর্তনের চিন্তাও পরিণত হয়েছে। আর কৃষির পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণও পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষির সাথে জড়িত নারীর শ্রমের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। উৎপাদন মূল্য নির্ধারণে নারীর শ্রমের মূল্যায়ন করা হয় না। তাছাড়া বেতন বৈষম্যতো আছেই, এদিকে ভূমির উপর নারীর অধিকার এবং বাজার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ এর ক্ষেত্রে এখনো নারীরা পিছিয়ে আছে। এই পরিবর্তিত কৃষি ব্যবস্থায় নারীর সিদ্ধান্ত কতটুকু গৃহীত হয় তা এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ।

নারীকে যেহেতু লোকজ জ্ঞানের আধার হিসাবে ধরা হয়, তাই মনে করা হয়ে থাকে যে নারীই পারে এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা বা পরিবর্তনে নিয়ন্ত্রকের আসনে আসীন হতে। কিন্তু তার জন্য আগে দরকার নারী সচেতনতা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাও নারী বান্ধব হতে হবে।

আলোচক: বিপাশা চাকমা, ইউএনডিপি

আদিবাসি জাতিগোষ্ঠী প্রকৃতির অনেক কাছে থাকে এবং দেখা যায় তারাই পারে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে। কিন্তু এই প্রকৃতি কোন কারণে পরিবর্তিত হলে, তাদের জীবনও পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু সেই পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থাকে কিভাবে স্বাভাবিক করা যায় তার জন্য তিনি গ্রুপভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাধান খোঁজার



জন্য অংশগ্রহণকারী সবাইকে বলেন। অংশগ্রহণকারীগণ তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়ে রাজশাহী অঞ্চলের একজন কৃষকের সমস্যার সমাধান খোঁজেন এবং তিনটি গ্রুপই তাদের নিজেদের মত করে সমস্যার সমাধান সবার সামনে তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় দিন

ক্লাস - ৫

বিষয় : **Response to Climate Crisis: International Agreements and Policies**

আলোচক : বিনোদ কণ্ঠি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং, দিল্লী, ভারত

এই আলোচনার শুরুতেই বিনোদ কণ্ঠি জলবায়ু সংকটে বৈশ্বিক পদক্ষেপগুলো সবার সামনে তুলে ধরেন। তাই তার আলোচনার শুরুতেই আসে, ইউ.এন.এফ.সি.সি সি এর ১৯৯২ সালের আর্থ সামিটের কথা। কারণ বিশ শতকের শুরুতেই মানুষ বুঝতে পারে, মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্যই জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে, যা ১৯৮৮ সালের আই.পি.সি.সি এর মূল্যায়ন রিপোর্টে উঠে আসে। ১৯৯২ সালে রিও ডি জিনেরিওর সভায় জাতিসংঘ তহবিলের ধারণা সংগঠিত হয়, আর সেখানে ইউ.এন.এফ.সি.সি সি এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের যেসব কর্মকাণ্ডের



বিনোদ কষ্টি

জন্য জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত হচ্ছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের নির্গমণ কমানো। এটি হয়েছিল জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর সুপারিশের মাধ্যমে। আর এই সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন ১৯৯৫ সালে কওপ (COP) এর মাধ্যমে হয়েছে। কিন্তু সেই মূল্যায়ন বলছে কাজিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

এরপর তিনি আলোচনায় আনেন ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকলের কথা, যদিও এটা আগের মত একই লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বিভিন্ন দেশের সক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্বগুলো ভাগ করে দেওয়া

হয়েছিল, কারণ সব দেশের সক্ষমতা সমান নয় এবং কিছু দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা আছে। সেজন্য তাদের উপর বেশি দায় বর্তায়। সেখানে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, উন্নত দেশসমূহকে গ্রীন হাউজ গ্যাস কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং উন্নয়নশীল এবং অনূন্নত দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন করতে পারে সে জন্য নিয়ন্ত্রিত হারে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণ করবে। এই সিদ্ধান্তের সময়কাল ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ছিল। কিয়োটো প্রটোকলের সময়কালে দ্বিতীয় ধাপে সময়সীমা আবার বাড়ানো হল, আর সেটা হল ২০১৩ থেকে ২০২০। ৩৭ টি দেশকে নির্ধারিত টার্গেট বেঁধে দেওয়া হল, সেখানে ৭ টি দেশ কেবলমাত্র তা গ্রহণ করলো। যদিও ২০১১ সালে কানাডা সেখান থেকে সরে আসে। প্রথম সময়সীমার সময়কাল শেষ হয়েছে ২০১২ সালে।

পরবর্তীতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সম্মেলন হয় ২০১৫ সালে প্যারিসে। সেখানে ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি সম্পাদন হয় এবং এই চুক্তিতে ১৯৫ টি সদস্য দেশ সাক্ষর করে। সেখানে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেন ২° ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে থাকে। এই লক্ষ্যে এনডিসি এর আওতায় প্রত্যেকটি দেশ তার নিজের লক্ষ্যমাত্রা এবং করণীয় ঠিক করবে, এখানে কারো উপর লক্ষ্যমাত্রা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। ২০১৭ সালে আমেরিকা প্যারিস চুক্তির এই সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। অন্যদিকে এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স সিদ্ধান্ত নেয় ২০৪০ সালের মধ্যে পেট্রোল এবং ডিজেল চালিত যানবাহন বন্ধ করার এবং ২০২২ সালের পর তারা

বিদ্যুৎ উৎপাদনে আর কয়লা ব্যবহার করবে না। নরওয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে তারা পেট্রোল এবং ডিজেল চালিত গাড়ি বন্ধ করবে, আর ২০৩০ সালের মধ্যে নেদারল্যান্ড বায়ু শক্তিকে ব্যবহার করে ট্রেন চালাবে এবং প্যারিস চুক্তি অনুসারে ২০৫০ সাল নাগাদ ৯৫% গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনবে।



এর পাশাপাশি যে বিষয়টি উঠে আসে সেটি হল এডাপটেশন এবং মিটিগেশন।

এর জন্য অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সাপোর্ট দরকার, আর সেজন্যে ২০১০ সালে গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড গঠন করা হয়। এই ফান্ডের বাৎসরিক অর্থমূল্য ১০০ বিলিয়ন ডলার, ২০১৮ সালের মে পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ এই ফান্ড থেকে ১০.৩ বিলিয়ন ডলার দাবি করতে পেরেছেন। এই ফান্ডের অর্থ যাবে মিটিগেশন এবং এডাপটেশন জনিত কর্মকাণ্ডের খরচে।

কিন্তু একটা সমস্যা এখানে থেকেই যাচ্ছে আর তা হল: পশ্চিমা উন্নয়নের মডেলে গরীণ হাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা বাধাগ্রস্ত হয়। যা এই সব বৈশ্বিক শক্তির দেশগুলোর মধ্যকার রাজনীতি আমূল পালটিয়ে দিতে পারে। তাই উন্নত দেশগুলোর মধ্যে দেখা দেয় এ নিয়ে মতানৈক্য।

আলোচক : বিপাশা চাকমা, ইউএনডিপি

আলোচক জলবায়ু পরিবর্তনের সাপেক্ষে বাংলাদেশের আইনগত এবং পরিকল্পনাগত পদক্ষেপগুলো সবার সামনে তুলে ধরেন। তিনি তার আলোচনার শুরুতেই বলেন, ১৯৯৫ সালের বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের কথা। যার উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের মান উন্নয়ন। ২০০৫ সালের ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অফ একশন (নাপা) - যা কওপ ০৭ এর ৭ম সেশনের সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ - এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কিছু মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে। যা কিনা বাংলাদেশের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একটি পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড থেকে অর্থ প্রাপ্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।



বিপাশা চাকমা

এই দিকে ২০০৫ সালে দশ বছর মেয়াদী (২০০৯-২০১৮) বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঘটিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হলেও ২০০৯ সালে আবার কিছু কর্মকাণ্ড এতে নতুন করে যোগ করা হয়। এই কর্ম পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় দরিদ্র এবং দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তাকে, যেখানে নারী এবং শিশুকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আর এটি তৈরি করা হয়েছিল ৬টি ভিত্তির

উপর নির্ভর করে, যা এখানে তুলে ধরা হল:

- ১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা
- ২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- ৩) উপযুক্ত কাঠামো নির্মাণ
- ৪) গবেষণা এবং জ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা
- ৫) কিভাবে কম কার্বন নিঃসরণ করা যায়
- ৬) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

এর ফলস্বরূপ ২০১০ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়। যা গঠন করা হয় সরকারের নিজ সদিচ্ছায় যেন সরকার নিজে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় গৃহীত কর্মকাণ্ডের অর্থায়ন নিজেই করতে পারে, যা গঠিত হয় বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইনের আওতায়। বাংলাদেশে এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বর্তমান সময়ে পরিচালিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ২০১২ সালে গৃহীত হয় সিপিআইআইআর নামক একটা রিভিউ, যা মূলত একটি টুল, যা জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহীত পলিসি পর্যালোচনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এই রিপোর্টে তিনটি বিষয়ের সমন্বয় করা হয়েছিল আর তা হল ১) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয়ভাবে গৃহীত পলিসির মূল্যায়ন ২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূল্যায়ন ৩) সম্পদের সুশ্রম বন্টন।

এই দিকে ২০১৪ সালে বাৎসরিক জলবায়ু কাঠামো গ্রহণ করা হয়, কিভাবে দেশের এবং বাইরের অর্থ কাজে লাগানো হবে। এরপর বাংলাদেশ ২০১৫ সালে একটি দশ বছরের রোডম্যাপ করে,

যেখানে গুরুত্ব পায় কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে এড্রেস করা হবে, এর সময়কাল ধরা হয় ২০১৬-২০২৫। এখানে উন্নয়ন যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়।

২০১৬ সালে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে পরিবেশগত বনায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন গুরুত্ব পায়। আর ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরে। এটি সরকারের ১০০ বছরের পরিকল্পনা, আর সেখানেও পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন গুরুত্ব পেয়েছে।

ক্লাস - ৬

বিষয় : Present Challenges to Address Climate Crisis: Global and Bangladesh

আলোচক : মো: শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী

সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরী রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট (সিপিআরডি)

পশ্চিমা উন্নয়নের মডেলে কোন দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রীণ হাউজ গ্যাস কমাতে পারে না। আর এই সূত্র মতে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে সেই উন্নয়ন ব্যহত হয়। তাই এখন প্রশ্ন আমরা আমাদের উন্নয়ন কোন মাপকাঠিতে মাপবো? তাই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় মতানৈক্য। জলবায়ু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী জেনেও বিশ্বের নেতারা একমতে পৌছাতে পারছে না। এই যখন পরিস্থিতি, তখন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সংগঠিত হতে যাওয়া কর্মকাণ্ডগুলো সঠিকভাবে হচ্ছে না। আর তখনই আসে লস এন্ড ডেমেজের



মো: শামসুদ্দোহা

কনসেপ্ট, যা এতদিন এডাপটেশন এবং মিটিগেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কর্মকাণ্ড চারটি এরিয়ার মধ্যে আটকে যাচ্ছে। আর তা হল:

- ১) এডাপটেশন (অভিযোজন)
- ২) মিটিগেশন
- ৩) লস্ এন্ড ডেমেজেস্
- ৪) ফান্ড মেনেজ্

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, এই ফান্ড আনার প্রক্রিয়া উপযুক্ত ছিল না, তাই চাহিদা মত ফান্ড বাংলাদেশ আনতে পারেনি। অংশগ্রহণকারী সবাই মনে করেছে যে, এখানে সিভিল সোসাইটির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, তাছাড়া পলিসিগুলো আরো জনবান্ধব হতে হবে। আর এজন্য যে জ্ঞানের দরকার তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে সরবরাহ করা উচিত এবং এর সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা উচিত।

ক্লাস - ৭

বিষয় : Food Security and State

আলোচক : মনিরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খাদ্য এবং পুষ্টি প্রয়োজনীয়তা মানুষের কর্মক্ষম হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। তাই দেখা যায় সমাজবিজ্ঞানীরাও খাদ্য এবং পুষ্টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। সমাজ বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেই কথা উঠে এসেছে বার বার। কিন্তু এখানে একটা ভাবনার বিষয়



মনিরুল ইসলাম খান

রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে জলবায়ু নিয়ে ভাবনা একমাত্র বিষয় নয়, কিন্তু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জলবায়ু খাদ্য উৎপাদনকে প্রভাবিত করে, আর অপুষ্টি সামাজিক স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই খাদ্যের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে সমাজে মানুষের শ্রেণী অবস্থান নির্ধারণ করা যায়।

প্রশ্ন আসবে খাদ্য নিরাপত্তায় রাষ্ট্রের ভূমিকা কি বা রাষ্ট্র এখানে কি করতে পারে? যদি সমাজবদ্ধ

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো রাষ্ট্র এখানে সম্প্রদায়ের স্থান নিয়েছে। তাই রাষ্ট্রের এখানে ভূমিকা অনেক বেশি রয়েছে। রাষ্ট্র এখন সমাজবদ্ধ মানুষের অভিভাবক হয়ে গেছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তায় ৪টি বিষয় খুবই গুরুত্ব পায়, আর তা হল:

- ১) খাদ্যের প্রাপ্যতা
- ২) খাদ্যের প্রাপ্যতার উপর নিয়ন্ত্রণ
- ৩) খাদ্যের উপযুক্ত ব্যবহার
- ৪) খাদ্যের যোগান

এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে এবং এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য। অন্যদিকে অমর্ত্য সেন মনে করেন, খাদ্য বাজারে থাকলেও সেটা সব মানুষের জন্য বরাদ্দ আছে কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানেই আসে রাষ্ট্রের গুরুত্বের কথা। কারণ রাষ্ট্র কতটা সুরক্ষিতভাবে খাদ্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় খুবই মনোযোগ আকর্ষণ করে আর সেটা হল সুষম খাদ্য। কারণ সুষম খাদ্যের অভাবকে এখন লোকায়ত দুর্ভিক্ষ হিসাবে দেখা হচ্ছে। এখানে অপুষ্টিতে লোকায়ত দুর্ভিক্ষ হিসাবে দেখা হচ্ছে, কারণ অপুষ্টির কারণে মানুষ বেঁচে থাকার মত বেঁচে থাকতে পারছে না।

সুষম আহারের জন্য একটা মানুষের দিনে ৮৩২ গ্রাম অর্থাৎ ২১১২ ক্যালরি খাবার গ্রহণ করতে হবে। তাই খাদ্য উৎপাদন হলেই কেবল হবে না, সেই খাদ্য সবার ত্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে কিনা সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তারপর প্রশ্ন আসছে নিরাপদ খাদ্যের। ফরাসী বিপ্লবের পর দেখা যায় এই খাতে প্রাইভেট সেক্টর ঢুকে পড়েছে। তাই রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী দুইয়ের উপরই খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে। তাই রাষ্ট্র এখানে একক ভূমিকা পালন করে না। তাছাড়া বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা মুনাফাকেন্দ্রিক। তাই খাদ্য নিরাপত্তা এককভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করছে তা কিন্তু না।

খাদ্য নিরাপত্তা কোন একক বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, এটা একটা সিস্টেম। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গৃহিত কৌশল নিরাপদ খাদ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। তাহলে প্রশ্ন আসে আমাদের নিরাপদ খাদ্য কে দিবে? এটা একটা জটিল বিষয় কারণ অনেক ধাপ অতিক্রম করে কৃষকের কাছ থেকে খাদ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছায়।

এখানে আরো প্রশ্ন আসে যে দারিদ্র্যতাকে আমরা খাদ্য দিয়ে পরিমাপ করবো কিনা? খাদ্য একটা মাধ্যম দারিদ্র্যতাকে পরিমাপ করার, কিন্তু কোন একক মাধ্যম না।

এই দিকে সরকার বলছে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করেছি, আসলেই কি আমরা খাদ্য

নিরাপত্তা অর্জন করেছি? এখানে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গড় যে উপাত্ত ব্যবহার করা হয়, তা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সঠিক রিফ্লেকশন না। কারণ আমরা সকল খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জন করতে পারি নি। এই দিকে যদি দেখি তাহলে দেখবো যারা উৎপাদক (কৃষক), তারা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে নি। আসলে বর্তমান সময়ে আমরা সবকিছু অনেক বেশি জটিল করে ফেলেছি।

ক্লাস - ৮

বিষয় : Commercialization of Production System and the Role of Corporate Capital

আলোচক : আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ১৭৯৩ সালে নতুন একটি শ্রেণী তৈরি হয় এই ভারতীয় উপমহাদেশে, আর সেই শ্রেণীকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবহার করে রাজস্ব আদায় করার জন্য, যা কিনা এক প্রকার কৃষির উপর চাপ তৈরি করে। কারণ ভারত উপমহাদেশের অর্থনীতি অনেকটা কৃষি নির্ভর ছিল।



আনু মুহাম্মদ

এইভাবে সেই জমিদার শ্রেণী তৈরি হল, যেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আরো বেশি রাজস্ব আয় করতে

পারে। এই রাজস্ব তোলাকে কেন্দ্র করেই কৃষকের উপর একটি অকৃষক শ্রেণী তৈরি হয়েছিল। সেখানে দেখা গেল ৪০-৫০ টি স্তর বিশিষ্ট শ্রেণী তৈরি হয়েছিল, আর তাদের জীবিকা ছিল খাজনা নির্ভর। আর এই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য চাহিদার কথা মাথায় রেখে কোম্পানীর ইচ্ছায় নীল এবং আফিমের চাষ এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হল। কিন্তু আফিম চাষের মাধ্যমে কৃষকের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। কারণ তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে চীনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে আফিম এর বাজার অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।

এই যে অভিজাত শ্রেণী তৈরি হল, তাদের জীবিকার উৎস কৃষি উৎপাদন থেকে দূরে এবং খাদ্য অপচয় করার মত একটি শ্রেণী, এদের কৃষি উৎপাদনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। পরবর্তীতে এই শ্রেণী থেকেই রাজনৈতিক শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধে ব্যয় বাড়ায় এবং সরবরাহ ঐ দিকে চলে যাওয়ায় ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এই উপমহাদেশে। এই সরবরাহ বজায় রাখতে এক ব্যবসায়িক শ্রেণী তৈরি হয়। যা কিনা পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ এবং তেভাগার মত বিভিন্ন আন্দোলনে রূপ নিতে দেখা যায়, যা পরবর্তীতে এক সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়।

দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে কৃষক সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। শুধু কৃষক নয় এই শ্রেণীকে টিকিয়ে রাখতে শিক্ষাখাতে এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে যখন ১৯৫০ সালে জমিদার প্রথা বাতিল হল, তখন সমাজে কোন বিরাট বিরোধ তৈরি হয় নি। তারপর নানাভাবে ভূমি সংস্কার করা হয় আর ১৯৭২ এ এসে শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়।

দেশভাগের পর জীবিকা ভূমি কেন্দ্রিক ফসল উৎপাদনে থাকলেও শিল্পায়নের হাত ধরে এদেশে এক পুঁজিবাদী শ্রেণী তৈরি হয়। তাছাড়া ১৯৬১ সালের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি থেকে পুঁজি বের করে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। তখন থেকেই শহর থেকে গ্রামে বিনিয়োগ করার রাষ্ট্রীয় চিন্তা দেখা যায়। আর তখনই কৃষক বাণিজ্যিক উৎপাদনের দিকে গেল, বিক্রয়ের জন্য গেল, কমন সম্পদগুলো কমে আসতে লাগলো, কমন সম্পদের উপর দরিদ্র শ্রেণী তাদের অধিকার হারালো। আর এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসলো। যেমন পাটের বাণিজ্যিক বাজার তৈরি হল। চিনির জন্য আখের বাণিজ্যিক মূল্য আসায়, চিনি মর্যাদার অংশে পরিণত হল সমাজে। আর এই দিকে আটা পরিণত হল গরীবের খাবারে।

ষাটের দশকে আইয়ুব সরকারের হাত ধরেই আসলো সবুজ বিপ্লব। আর তখনই দরকার হয়ে পড়ল রাসায়নিক উপাদান এবং পর্যাপ্ত পানির সেচ ব্যবস্থা। সবুজ বিপ্লবের ফলে দেখা যায় ১৯৬৯ সালের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার মত পরিকল্পনাগুলো। আর তখন দরকার হয়ে পড়লো স্যালো টিউবওয়েল, ডীপ টিউবওয়েল ও কীটনাশক; যা কিনা সবই আমদানী নির্ভর। অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে নির্ভরশীলতা তৈরি হল, কৃষি কোম্পানী নির্ভর হয়ে পড়লো। শুরুতে কৃষক রাজি ছিল না, কিন্তু পাকিস্তানে মিলিটারি শাসন ছিল বিধায় সম্ভব হয়েছিল। তখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ডীপ টিউবওয়েল বসানো হত, আর প্রচার করা হত রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ভর্তুকি দেওয়া হত সার ব্যবহারে। এর মাধ্যমে কৃষির ইনপুট বাজার তৈরি হল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আরো বাণিজ্যিকীকরণ হল এই খাত। আর এর প্রভাবে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা নষ্ট হয়ে গেল। দেখা দিল আর্সেনিকের মত রোগের কিন্তু তখন বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা হয় নি, যার ফলে আমরা আমাদের বর্তমান কৃষির অবস্থা দেখতে পাচ্ছি।

রিইব গবেষণা সহযোগী আবুল ফজল বলেন, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে আমরা তো সেই আগের নীল চাষের মত অবস্থাতেই আছি, সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে কোম্পানী। কিন্তু এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে, নীল চাষের সময় কৃষক তার প্রতিপক্ষ কে তা জানতো কিন্তু বর্তমান সময়ে কৃষক তা জানে না। আর এই সময় এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতার তুলনায় পুঁজির ক্ষমতা অনেক বেশি। তাছাড়া দুই ক্ষমতার মধ্যে কোন পার্থক্যও নেই। তাহলে এখন প্রশ্ন আসে এখানে সমাজতান্ত্রিক দলগুলো কি করবে? তারা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে ভাববে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে। আর এই ব্যবস্থা নিতে হবে সামগ্রিক অবস্থা বিচার করে।

তৃতীয় দিন

ক্লাস - ৯

বিষয় : Agricultural Dimension of Bangladesh

আলোচক : এম. এম আকাশ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক এম. এম আকাশ বলেন, টেকসই লক্ষ্যমাত্রার কথা বিচার করলে দেখবো এখানে কৃষির সাথে সম্পর্কিত রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন। কিন্তু এখানে দরিদ্রতাকে ভাবা হয় বহুমাত্রিকভাবে, যেমন:

শিক্ষা

স্বাস্থ্য (চিকিৎসা/ আয়ু)

বাসস্থান

নিরাপদ পানি

নিরাপদ খাবার

জবাবদিহীতা এবং স্বচ্ছতা



এম. এম আকাশ

এখানে দরিদ্রতাকে দেখা হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে। তাছাড়া আমাদের কৃষির সাথে জড়িত কৃষকদের মধ্যেই দারিদ্র্যের হার বেশি। তাই এখানে দারিদ্র্য বিবেচনা করলে কৃষকের দারিদ্র্যও বিমোচন হবে। দ্বিতীয় লক্ষ্যটি যদি দেখি সেটি হচ্ছে ক্ষুধা মুক্তি, সেখানেও কৃষি উৎপাদন জড়িত। কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখছি ক্ষুধা মুক্তির পূর্বশর্ত পূরণ হয় কৃষির উৎপাদন দিয়ে। কিন্তু সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য বরাদ্দ আছে কিনা সেটা

দেখা হচ্ছে না। বর্তমান সময়ে গরীব কৃষক এখন ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। নিম্নগামীতার দিকে যাচ্ছে, সামাজিক মর্যাদাও কমে আসছে। কৃষকের জীবন মান দিন মজুরের থেকেও কমে এসেছে। সেক্ষেত্রে অকৃষি কাজ থেকে সাপোর্ট থাকলেই এই নিম্নগামীতা থামানো সম্ভব। দেখা যাচ্ছে কৃষককে বাঁচতে হলে বর্গা করতে হবে। আর এর জন্য দরকার পুঁজি, যা আসে ঋণ বা প্রবাসীর পাঠানো অর্থ থেকে। কিন্তু কৃষিতে একটা বিরাট অংশ দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে।

তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে যে, যখন কৃষির সমস্যা কৃষি দিয়ে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না তখনই এটি শিল্পে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ব্যবধান কমবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বাজার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে কৃষি খাতের গুরুত্ব কমেছে পেশা হিসাবে। অনেকেই এখন অপ্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন পেশার দিকে যাচ্ছে, ফলে তারা এসে ভিড় করছে শহরে। তাহলে প্রশ্ন হল এই ভিড়ের সমাধান কি হতে পারে। এর ফলে একটা শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। এজন্যে দরকার হয়ে পড়েছে কৃষির আধুনিকায়নের, ফলে কৃষিতে কর্মের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ইনফরমাল সেক্টরকে ফরমাল করতে হবে। আর এতে প্রবেশাধিকারের জন্য দরকার শিক্ষার, আর সেই শিক্ষা হতে হবে কর্মমুখী।

এখানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রভাব দরকার, পুঁজির স্থানান্তর করতে হবে গ্রামে। তার পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তি এবং রাজনৈতিক ভারসাম্যই পারে সমাধানের পথ খুঁজে পেতে।

ক্লাস - ১০

বিষয় : Climate & Green Revolution related Challenges of Bangladesh Agriculture

আলোচক : সুরাইয়া বেগম, প্রকল্প সমন্বয়ক, রিইব

আলোচনার শুরুতেই সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে সুবিস্তৃত ধারণা সবার সামনে তুলে ধরেন। সবুজ বিপ্লবের ধারণা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সবুজ বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। ফলে দানাশস্য গম ও ধান চাষের মত একক শস্যকে চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু সবজি, ডাল, মশলা ও তেল জাতীয় শস্য সেভাবে গুরুত্ব পায় নি। সবুজ বিপ্লবের ফলে প্রথমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু পরে তা ক্রমশ:



সুরাইয়া বেগম

হ্রাস পেতে থাকে। কারণ মাত্রাতিরিক্ত সার বিষের ব্যবহারের ফলে জমিতে ও ফসলে বিষক্রিয়া হয়ে মাটি ক্রমশঃ নষ্ট হয়েছে, কোটি কোটি অনুজীব ধ্বংস হয়েছে। ক্রমাগত কীটনাশক বিষ, সার প্রয়োগের ফলে যেসব শত্রু পোকা কোন রকমে বেঁচে যায় তাদের মধ্যে প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আরও বেশি কীটনাশক বিষ ব্যবহার করতে হচ্ছে।

এদিকে উচ্চ ফলনশীল বীজ দ্বারা চাষাবাদ করতে যেয়ে সেচের কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে, পানির স্তর ক্রমশঃ নিচে নেমে যাচ্ছে। এর ফলে আর্সেনিকের প্রকোপ বেড়েছে, মাটির নীচে আমাদের রিজার্ভ খনিজ পানি দূষিত হচ্ছে। তাছাড়া উফসি বীজের চাষাবাদের উপকরণ ব্যয়ও বেশি কিন্তু বিক্রয় মূল্য সেই অনুপাতে কম হয়ে গেছে। বর্তমানে কৃষক বাণিজ্যিক কৃষিতে আকৃষ্ট হচ্ছে বেশি। ফসল বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। স্থানীয় জাতের শস্য হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যেখানে বীজ হচ্ছে কৃষির মা, সেখানে বীজের সার্বভৌমত্ব ও হারিয়ে যাচ্ছে। কৃষক কোম্পানী নির্ভর হয়ে পড়েছে দিন দিন। ইকোসিস্টেম নষ্ট হচ্ছে এর ফলে। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। যেমন ডেঙ্গু বাড়ছে প্রাকৃতিকভাবে মশা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার ফলে। কর্পোরেট গোষ্ঠী বিকশিত হচ্ছে, শস্য জমি বাণিজ্যিক চাষাবাদে ব্যবহার হচ্ছে। মাটির প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেছে। জমিতে বার বার একই ফসল আবাদের ফলে মাটি নষ্ট হয়ে গেছে।

অন্যদিকে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখা দিয়েছে। শিল্পায়নের ফলে নির্গমন বায়ুকে দূষিত করে ফেলেছে, পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ছে। কলকারখানার আবর্জনা নদীর পানি বিষাক্ত করে ফেলেছে, ফলে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিনাশ হচ্ছে। যা কিনা মানব গোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। তার ফলে ক্যানসার এবং ডায়াবেটিক এরকম রোগের প্রভাব বেড়ে গেছে। অধিক গরম, শীতকালে শীত না থাকা, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় বেড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাতাস উষ্ণ হলে ফলন কম হয়। আবার মাঝারি গরমে ফলন ভাল হলেও অতিরিক্ত গরমে ফলন কম হয়। তাছাড়া রাতের বেলা উষ্ণতা বৃদ্ধি উৎপাদনে প্রভাব রাখে। যেমন, এ ধরনের ঘটনায় ২০১২ সালে মিশিগানে চেরি ফল উৎপাদনে ২২০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছিল। এই দিকে কার্বন নিঃসরণের ফলে খাদ্যশস্যের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের উচিত জলবায়ু সংকট রোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। যার ফলে আমাদের কৃষি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবে।

বিষয় : Agro-ecology in the Light of Climate Crisis & Sustainable Agriculture (FAO)

আলোচক : মোঃ ইফতেখার আলী, মাঠ সমন্বয়ক, রিইব

কৃষি বাংলাদেশের ঐতিহ্য এবং মূল চালিকা শক্তি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের চেয়ে আমাদের কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কৃষির উপর আমাদের দেশের অর্থনীতির নির্ভরশীলতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপরই নির্ভরশীল। তাছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচনের মত বিষয়গুলোতে কৃষির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা দেশগুলো 'উন্নয়ন' নির্ভর অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে

অন্যান্য সদ্য-স্বাধীন হওয়া দেশগুলোকে 'অনুন্নত' অ্যাখ্যা দিয়ে সেই দেশগুলোর 'উন্নতি'র দায়িত্ব নেয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে, 'পশ্চিমা জীবনধারা' বা 'আমেরিকান লাইফস্টাইল' অর্জনে মনোযোগী হয়। পশ্চিমা দেশগুলোও প্রয়োজনীয় পুঁজি, প্রযুক্তি, কাঁচামাল ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহ এবং কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। পরবর্তিতে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'র মাধ্যমে পুরো বিশ্ব একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়। আর কৃষিতে এই উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ হিসেবে আসে সবুজ বিপ্লব। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সবুজ বিপ্লবকে বৈদিশিক নীতির অন্যতম উপাদান হিসাবে যুক্ত করে। এই সবুজ বিপ্লব প্যাকেজে ছিল:

- উচ্চ ফলনশীল বা হাই ইনপুট রেসপনসিভ বীজ
- রাসায়নিক বা সিনথেটিক সার
- বালাইনাশক বিষ
- সেচ যন্ত্র

এসব কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এর ফলে পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে আমাদের কৃষকরা যুক্ত হয়ে যায়। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এভাবে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে, কিন্তু দরিদ্র মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয় নি,



মোঃ ইফতেখার আলী

বরং তা আরো জটিল হয়েছে এবং অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীববৈচিত্র্যের ঢালাও বিনাশ এবং পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয় হয়েছে। তাই সুস্থায়ী লক্ষ্যমালা অর্জনে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এগ্রোইকোলজি বা জীব বৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির কথা প্রচার করছে। তাঁদের মতে জীব বৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির উৎপাদন প্রচলিত কৃষির চেয়ে বেশি। এতে ফসলহানির ঝুঁকি কমায়, খাদ্য বৈচিত্র্য বাড়ায় এবং ক্ষুদ্র কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে। এছাড়া বড় খামারের থেকে ছোট খামারের উৎপাদনশীলতা বেশি এবং স্থানীয় জনগণের খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনে সহায়ক, তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাত মোকাবেলায় বেশি স্থিতিস্থাপক। এই সুস্থায়ী কৃষি করা সম্ভব ইকোলজিকাল রেজিলেন্স বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি বন্ধন শক্তিশালী করার মাধ্যমে। খামারে শস্য, অশস্য, প্রাণী, অনুজীব বৈচিত্র্য লালন ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে ইকোলজিক্যাল রেজিলেন্স বৃদ্ধি করা যায়। জীব বৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিতে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা নিম্নে তোলে ধরা হল:

১. খামারে মাটির চরিত্র ও জলবায়ুর উপযোগী স্থানীয় বিভিন্ন শস্যের চাষ করা ও বীজ সংরক্ষণ (যত বেশি সম্ভব প্রজাতি ও জাত)

- অন্তর্বর্তী শস্য চাষ
- পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ
- চক্রাবর্তী চাষ ও বিভিন্ন শস্যের সঙ্গবদল
- বহুতলী মিশ্র চাষ ইত্যাদি
- শস্যের জাতের বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি

২. বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় অ-শস্য সঙ্গী উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বাড়ানো

- পুষ্টি উপাদান সরবরাহ
- বাড়তি সঙ্গী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ
- শস্যের শত্রু পোকা দমন
- শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ

৩. কৃষি-ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত প্রাণীদের প্রজাতি বৈচিত্র্য বৃদ্ধি

- পুষ্টি উপাদান সরবরাহ
- শস্যের শত্রু প্রাণী দমন
- শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ

৪. অনুজীবের বৈচিত্র্য বাড়ানো

৫. মাটি সংরক্ষণ (জাবড়া দেওয়া এবং

৬. জৈব সার, জীবাণু সার, পাতা সার ব্যবহার
৭. পানির সূষ্ঠ ব্যবহার ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন
৮. নারীদের যথাযথ অংশগ্রহণ

এর ফলে খামারের সকল প্রাকৃতিক চক্রসমূহ বজায় থাকে (পানি চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র ইত্যাদি)। উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো বজায় থাকে। এই দিকে খামারের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বজায় থাকে (উৎপাদনশীলতা মানে শুধু নির্দিষ্ট ফসলের উৎপাদন নয় বরং খামারের সব কিছুর সার্বিক অবস্থা)। এই দিকে স্থানীয় কমিউনিটি বা সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে কৃষিকে সুস্থায়ী করা সম্ভব।

এই যখন বর্তমান অবস্থা তখন বাংলাদেশ সরকারকে দেখা গিয়েছে কিছু পদক্ষেপ নিতে। যেমন;

- সমন্বিত বালাই ও ফসল ব্যবস্থাপনা (আইপিএম ও আইসিএম)
- পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা
- বাংলাদেশ কৃষি গ্রন্থাগার ইন্সটিটিউট কর্তৃক 'বাংলাদেশ অর্গানিক এগ্রিকালচার নেটওয়ার্ক' প্রতিষ্ঠা করা।
- সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বন্ধপরিচর
- জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা
- খাদ্য পরিবহণে পাটের ব্যাগ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি।

ক্লাস - ১২

বিষয় : **Climate Smart Agriculture (CSA)**

আলোচক : সাইদুর রহমান, ফ্রিল্যান্স গবেষক

জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিনির্মে আলোচনা প্রসঙ্গে সাইদুর রহমান ব্যবস্থার ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় সুস্থায়ীত্বতা আসবে, গ্রীণ হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমবে এবং পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। এই কৃষি ব্যবস্থার তিনটি ভিত্তি:

১. কৃষিজ উৎপাদন এবং আয়ের সুস্থায়ী বৃদ্ধি
২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা
৩. কম মাত্রায় গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ করবে

এই তিনটি লক্ষ্য অর্জিত হলেই সেই কৃষিকে আমরা



সাইদুর রহমান

জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি বলতে পারি। এই কৃষি ব্যবস্থায় যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, নিম্নে তা তুলে ধরা হল:

১. খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে একই সাথে দেখা হয়
২. এই কৃষি ব্যবস্থা স্থান নির্ভর আলাদা হয়ে থাকে
৩. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সমন্বয় সাধন
৪. বাধাগুলোর সম্ভাব্য সহজ সমাধান বের করা
৫. নীতি, অর্থ বিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন
৬. কোন একক উদ্দেশ্য নির্ভর হবে না
৭. ক্ষুদ্র কৃষকদের সেবা, জ্ঞান এবং সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার থাকবে
৮. পরিবর্তিত আবহাওয়া সহনশীল জাত নির্ভর কৃষি
৯. জলবায়ু পরিবর্তনে মিটিগেশনকে গুরুত্ব দেওয়া হবে
১০. কৃষির ঐতিহ্যগত চর্চার সাথে সমন্বয় সাধন করা

জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এই কৃষি ব্যবস্থার কিছু বাধা আছে, যেমন: খারাপ অবকাঠামো, সম্পদের অভাব, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত তথ্যের অভাব, জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতি এবং বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশেও জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষিব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে; কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই কৃষি নিয়ে কাজ করে চলেছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বারি) এই গবেষণা প্রসারে কাজ করে চলেছে। কিন্তু এই কৃষি আবার আমাদেরকে নির্ভরশীলতার দিকে নিয়ে যাবে। কারণ এই কৃষির প্রযুক্তি আবার কোম্পানী নির্ভর হয়ে পড়বে। তাছাড়া কৃষক কতটা গ্রীণ হাউজ গ্যাস কমানোর কথা ভাববে তা প্রশ্ন বিদ্ধ। আর এই জন্য আমাদের খাদ্য ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন আনা দরকার। আর তার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে:

- বিকল্প চিন্তার জায়গা থাকতে হবে
- উন্নয়নের চিন্তায় পরিবর্তন আনতে হবে
- শিল্পায়ন থেকে সরে আসতে হবে
- খাদ্য সার্বভৌমত্বের কথা ভাবতে হবে
- স্থানীয় খাদ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে
- খাদ্য ও পুষ্টিকে গুরুত্ব দিতে হবে

চতুর্থ দিন

ক্লাস - ১৩ এবং ১৪

বিষয় : **Approaches to Cost Calculation & Sensitivity to Society-Environment**

Climate Sensative Resource Management

আলোচক : আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়নকে যখন শিল্পায়ন দিয়ে মাপা হয় তখন এই উন্নয়ন একচোখা হয়ে পড়ে। কিন্তু এই শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ যেভাবে দূষিত হয়েছে সেটা আর এই উন্নয়নের মাপকাঠিতে আনা হয় নি। তাই উন্নয়ন যদি আমাদের লাভ হয় তাহলে এর হিসাব সামগ্রিকভাবে করা উচিত। কস্ট ক্যালকুলেশন যেন সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়।

এই দিকে মার্কেট যত প্রসারিত হবে, জিডিপি তত বাড়বে। কিন্তু এর ফলে ক্ষতি কি হয়েছে সেটা জিডিপি এর হিসাবে প্রভাব ফেলে না। এ যেন একচোখা দানব।

কৃষিতেও তেমনি একি জিনিস ঘটছে, ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি (সি এস এ) বাজার প্রসারিত করবে, তাই এটি জিডিপিতে প্রভাব ফেলবে, কিন্তু এর কি প্রভাব পড়বে তা আর হিসাব করা হয় না। যা কিনা আমাদের নীতি নির্ধারকদের মাঝেও এমনটা দেখা যায়।



আনু মুহাম্মদ

উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সক্ষমতায় প্রাধান্য দেওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে নিজস্ব সম্পদগুলো ব্যবহার করার কথা ভাবা দরকার, কিন্তু তা করা হয় নি। বরং আমরা অনেক বেশি বিদেশী ঋণ এর উপর নির্ভরশীল, কেননা এর মাধ্যমে বাইরের নীতি একটি দেশের উপর সহজে চাপিয়ে দেওয়া যায়। আর এর ফলে কোম্পানীগুলোর লাভ হয়। তাই আরো ভালভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের।

ক্লাস - ১৫

বিষয় : **Charting the Future Course: A need for multi-pronged approach with a goal of developing techniques and strategies for intervention**

আলোচক : মনিরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



মনিরুল ইসলাম খান

যখন আমরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে বা কাজ করতে চাচ্ছি, তখন সেখানে আমাদের প্রতিপক্ষ কে হবে সেটা নিয়ে আমাদের ভেবে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাছাড়া এই চারদিনে অনেক কিছুই আমরা এখান থেকে জেনেছি, কিন্তু ভাল হবে যদি সেটা আমরা কাজে রূপান্তরিত করতে পারি। আমরা আরো চাই মানুষের লুকিয়ে থাকা স্বকীয়তা বের করে নিয়ে আসা। এই চারদিনের স্কুল থেকে আমরা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি আর

তা হল জলবায়ু সংকটের পিছনে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অবদান রয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন একটা সিস্টেম তাই একে আর একক কোন মাত্রা দিয়ে ভাবার আর কোন প্রকার সুযোগ নেই। আর এই চারদিনে সেটা আরো পরিষ্কার হয়েছে যে শিল্পায়ন এর জন্য দায়ী।

জলবায়ু সংকটের বড় একটা প্রতিবন্ধকতা হল এর বিজ্ঞাননির্ভর ব্যাখ্যা। কারণ জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় আমাদের সবারই এগিয়ে আসতে হবে, কিন্তু আমরা সবাই বিজ্ঞানী না। তাহলে সবাই কিভাবে বুঝবে বা অন্যকে বোঝাবে তারা জলবায়ু সংকটের শিকার? তাই এই বিষয়ে আমাদের আরো ভাবার রয়েছে।

আরো দেখা যাচ্ছে যে এই সংকটের পিছনে মূল দুইটি কারণ জড়িত আর তা হল মুনাফা এবং ভোগবাদী সংস্কৃতি। তাই আমাদের এখন দরকার হয়ে পড়েছে মুনাফাকে সামগ্রিক দিকে থেকে ভাবার, কারণ মুনাফা যেন কেবল অর্থ নির্ভর না হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভোগ কমিয়ে আনা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং, তাই এমন পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি তা ঠিক করতে হবে।

এদিকে দেখলাম আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচক এর নতুন সংজ্ঞায়ন, কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল এই দায়িত্ব কে নেবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র, ব্যক্তি এবং সম্মিলিত দলের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু কোম্পানী নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এখানে অসহায়, রাষ্ট্র এখন পরিণত হয়েছে কাণ্ডজে বাঘে। ব্যক্তির নিজের পক্ষেও একা করা সম্ভব নয়। তাই এখানে সামষ্টিক শক্তি এবং সচেতনতা লাগবে। তার আগে দরকার উন্নয়নের চিন্তাধারায় পরিবর্তন এবং সম্মিলিতভাবে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। আর সেই পথকে সুগম করতে ক্রিটিকাল একটর খুঁজে বের করতে হবে, আর ভাবতে হবে কাদের সাথে মিলে কাজ করতে হবে আর কাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

ক্লাস - ১৬

বিষয় : Thought of Alternative Development

আলোচক : বিনোদ কষ্টি, প্রোথাম
ম্যানেজার, রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং,
দিল্লী, ভারত



বিনোদ কষ্টি

বর্তমানে আমাদের কৃষকের অবস্থা
অনেকটা নিচের ছকে বর্ণিত অবস্থার মত,
এখানে ছোট কৃষকের পরিস্থিতি সবসময়ই
খারাপ থাকে। আর এই কথার সাথে
উপস্থিত সকল কৃষক একমত।

	ভাল বছর	সাধারণ বছর	খারাপ বছর
বড় কৃষক	ভাল লাভ	লাভ	কোনও ক্ষতি নেই
মধ্য কৃষক	লাভ	কোনও ক্ষতি নেই	ক্ষতি
ছোট কৃষক	বেশি লাভ নেই	ক্ষতি	বড় ক্ষতি

উন্নয়নের চিন্তায় বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে যা অনুসরণ করা যেতে পারে, যেমন:

- ডি-গ্রোথ (De-growth)
- র্যাডিক্যাল ইকোলজিকাল ডেমোক্রেসি (Radical Ecological Democracy)
- বুয়েন ভিভির (Buen Vivir)

এখানে তুলে ধরা হয়েছে কিছ বিকল্প গ্রোথের কথা, আর যা নিয়ে আমাদের সবার ভাবার আছে বলে তিনি মনে করেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

এর আগে সকলে কৃষি ও জলবায়ু সংকট বিষয়ক স্কুল সম্পর্কে লিখিত মতামত জানান। এই আবাসিক স্কুলের বিষয়ে অংশগ্রহণকারী সবাই তাদের নিজেদের মূল্যায়ণ তুলে ধরেন, যার সারাংশ এখানে উপস্থাপন করব করব হল।

- জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি সরাসরি জড়িত। এটি একটি জটিল ও সমন্বিত আলোচনার বিষয়। এই দিকটি মনোযোগে নিয়ে এই আয়োজন ভাল লেগেছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন কেবল আবহাওয়া জনিত বিষয় নয়। এর সাথে রাজনীতি ও বাণিজ্যিকীকরণসহ আরো বিষয় জড়িয়ে আছে সেটি উন্মোচিত হয়েছে।
- কৃষি প্রশ্ন কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় তা নিয়ে আরো গবেষণা করা দরকার।
- অ্যাডাপটেশন, ফুড সিকিউরিটির ধারণাটি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে রয়েছে। সেটি নিয়ে লিখতে চাই।
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভবিষ্যতে যোগাযোগ থাকা দরকার।
- এই প্রশিক্ষণের জন্যে একটি ম্যানুয়াল তৈরি করলে ভাল।
- যৌথভাবে কাজ করা যায়; প্রকাশনা বিনিময় করা এবং বার্ষিক, অর্ধ-বার্ষিক সভার আয়োজন করা।
- এই স্কুল পর্যায়ক্রমে উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে করা।

আলোচনা শেষে প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চার দিন ব্যাপী কৃষি ও জলবায়ু সংকট বিষয়ক কেন্দ্রীয় স্কুলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।





Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research ("Gonogobeshona") on the development schemes that affect them most, in order to develop ownership and generate community mobilization. For more information please visit <https://www.rib-bangladesh.org>



Rosa Luxemburg Stiftung

Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit www.rosalux.in